বারোদীঘির রায়বাড়ি

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির

৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৬৬
অগস্ট ১৯৫৯
প্রকাশ করেছেন
অমিয়কুমার চক্রবর্তী
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলকাতা-১২
ছেপেছেন
তারক দত্ত
শ্রীভারতী প্রেস
১৭০, রমেশ দত্ত স্ট্রীট
কলকাতা-৬
প্রচ্ছদ এঁকেছেন
গণেশ বসু

কল্যাণীয়

শ্রীমান আলোকনাথ চট্টোপাধ্যায়

স্নেহাস্পদেষু

আশীর্বাদক কাকা

'বারোদীঘির রায়বাড়ি' ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়—ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লেখা উপন্যাস। যে সময়ে ভারতে মুসলমান রাজত্ব ভেঙে পড়ছে অথচ বিদেশী রাজত্বও শুরু হয় নি, প্রধানত সেই সময়কার নিম্নবঙ্গের একটা ছবি এতে দেবার চেষ্টা করেছি। দিল্লীতে তখন বাদশাহ নামে-মাত্র—তাঁর সে দোর্দণ্ড প্রতাপ আর নেই। সুযোগ বুঝে দেশের নানা অঞ্চলে ছোটখাট জমিদাররা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছেন এবং কেউ-কেউ নিজের নিজের এলাকায় বেশ ক্ষমতা-শালীও হয়ে উঠেছেন। ইতিমধ্যে ইয়োরোপের নানা অঞ্চল থেকেও বিদেশী বণিকরা বাণিজ্যের নাম করে এখানে এসে ঘাঁটি গেড়েছে। এদের মধ্যে তখন প্রধান হচ্ছে পর্তুগিজরা,—কিন্তু বাণিজ্যের চাইতে লুঠতরাজের কাজেই তারা বেশি দক্ষ। এ দেশের লোকের কাছে তারা ফিরিঙ্গি নামে পরিচিত। এই ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে আবার যোগ দিয়েছে দুরন্ত আরাকানি মগ দস্যুরা। নবাবি ফৌজের পক্ষে এদের সঙ্গে এঁটে ওঠা কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে দেখা দিয়েছে দেশ-জোড়া অরাজকতার আভাস।

অধুনালুপ্ত সপ্তগ্রামই তখন বাংলার প্রধান বাণিজ্যনগরী। সুন্দরবনেরও তখন বর্তমান দুর্দশা দেখা দেয় নি—তারও নানা অঞ্চল তখন লোকবসতিপূর্ণ। প্রধানত এইসব অঞ্চল এবং তার বাসিন্দাদের কেন্দ্র করেই বইয়ের গল্পাংশ গড়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য গল্পের সমস্ত চরিত্র এবং ঘটনাই কাল্পনিক—তবে এর ঐতিহাসিক পটভূমিকাটিকে যথাযথভাবে কালোপযোগী রাখবার চেষ্টার ক্রটি করি নি। এজন্য সমসাময়িক যুগের বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থের সাহায্যও নিয়েছি। এখানে তাদের তালিকা দিয়ে ভূমিকার কলেবর বাড়াতে চাই না।

এই উপন্যাসখানি 'রাধামাধবের রত্নহার' এই নাম দিয়ে বছর তেরো-চৌদ্দ আগে আমার সম্পাদিত ছোটদের মাসিক 'রামধনু' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রধানত কিশোরদের জন্যই এটি রচিত, তবে ভাষার দিক দিয়ে স্থান-কাল-পাত্রের সঙ্গে যতটা সম্ভব সামঞ্জস্য রাখবার চেষ্টা করেছি।

১৬, টাউনশেণ্ড রোড, কলকাতা-২৫
১লা শ্রাবণ, ১৩৬৬

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন বাংলা দেশে মুসলমান রাজত্ব ভাঙিয়া পড়িতেছে, কিন্তু ইংরাজ রাজত্ব শুরু হয় নাই। দিল্লীতে বাদশাহ একজন আছেন বটে কিন্তু তার সে দোর্দণ্ড প্রতাপ আর নাই। সুযোগ বুঝিয়া দেশের ছোট-বড় জমিদারেরা মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছেন। তারা নবাবকে কর দেন এই পর্যন্ত, কিন্তু চালচলনে অনেকটা স্বাধীন রাজার মতই চলেন। তাদের সকলেরই অধীনে ভাল ভাল পাইক, লাঠিয়াল আছে—দরকার হইলে ছোটখাট যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতেও তারা পটু। মোট কথা, গোটা দেশ জুড়িয়া যেন কেমন একটা বিশৃঙ্খলা চলিতেছে।

এদিকে সুদূর ইয়োরোপ হইতে নানা জাতি বাণিজ্যের নাম করিয়া ধীরে ধীরে এ দেশে আসিয়া জড় হইতেছে। তারা শুধু ব্যবসাই করিতেছে না,—কুঠি বসাইয়া, কেল্লা বসাইয়া এবং দরকার-মত লড়াই করিয়া নানা জায়গা দখল করিতেও কসুর করিতেছে না। এদের মধ্যে পর্তুগিজ আছে, ওলন্দাজ আছে, আবার হালে ইংরেজ-ফরাসিরা আসিয়া জুটিয়াছে। তবে পর্তুগিজদের প্রতাপটাই কিছু বেশি। পশ্চিম ভারতে এই পর্তুগিজেরা কয়েকটি বড় বড় ঘাঁটি দখল করিয়াছে, পর্তুগালের রাজপ্রতিনিধি সেখানে শাসনকর্তা হইয়া বসিয়াছেন। বাংলা দেশেও বাণিজ্যের নাম করিয়া তাদের আসা-যাওয়ার বিরাম নাই। কিন্তু এখানে তারা শুধু ব্যবসা করিতেছে না—সুযোগ পাইলেই লুট-পাট করিয়া, ডাকাতি করিয়া সারা দেশে এক নূতন উপদ্রবের সৃষ্টি করিতেছে। বিশেষত জলপথে তো তাদের প্রতাপ অসীমই বলা চলে। তাদের বড়-বড় জাহাজ, বন্দুক-কামান প্রভৃতি আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র এবং সুশৃঙ্খল রণকৌশলের সম্মুখে স্থানীয় শক্তিগুলি যেন কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ফলে এই দুরন্ত হার্মাদ বা ফিরিঙ্গি দস্যুদের উৎপাতে সারা বাংলাদেশ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিপদের উপর বিপদ, ইহাদের সঙ্গে আবার পাল্লা দিয়া যোগ দিয়াছে

নিষ্ঠুর আরাকানী বা মগ ডাকাতের দল। এক কথায়, বাংলা দেশের শান্তিপ্রিয় অধিবাসীরা আর কেহই বড়-একটা শান্তিতে নাই।

আশ্বিন মাস। গঙ্গা একেবারে কূলে কূলে ভরা। লাল জল-স্রোত পাক খাইয়া খাইয়া সবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, ঢেউগুলি দু-ধারে প্রায় সমুদ্রের মত করিয়াই আছড়াইয়া পড়িতেছে। দু-পাশে ঘন জঙ্গল; তারই মাঝে মাঝে দু-একটা বড় বড় শাল বা সুন্দরি গাছ মাথা উঁচাইয়া দাঁড়াইয়া আছে, যেন উপরের আকাশটাকে ভাল করিয়া খুঁজিয়া নিতে চায়। কাছাকাছি কোথাও লোকালয় বড়-একটা চোখে পড়ে না।

একখানি বজরা গঙ্গার উপর দিয়া উত্তরাভিমুখে চলিতেছিল। বজরাখানি বেশ বড়। মাঝি-মাল্লা, পাইক-বরকন্দাজ, লোকজন সমেত প্রায় উনিশ কুড়ি জন হইবে। হয়ত কোন জমিদারের বজরা। বজরার গায়ে পিতলের খোদাই কাজ, এবং ছাদে বন্দুকধারী শান্ত্রীটিকে দেখিয়া তাহাই মনে হয়।

বেলা তিন প্রহর পার হইতে চলিল। সূর্য পশ্চিমাকাশে অনেকটা নিচে হেলিয়া পড়িয়াছে। বাতাসের গরম ভাবটা কমিয়া একটু একটু ঠাণ্ডার আমেজ দিতেছে। বজরার কামরার ভিতর হইতে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক বাহির হইয়া আসিলেন। প্রৌঢ়ের চেহারা গৌরবর্ণ, মাথার চুলে কিছু কিছু পাক ধরিয়াছে। মুখে এবং পোশাক-পরিচ্ছদে আভিজাত্যের ছাপ। প্রৌঢ়ের নাম মৃগাঙ্ক রায়,—ইনিই বজরার মালিক।

মৃগাঙ্ক রায় বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কত দূর এলাম রে?'

একজন মাঝি বিনীতভাবে কহিল, 'আজ্ঞে হুজুর, মতিয়ার চর পার হয়ে এসেছি, সামনেই পোড়া বটের বাঁক। সন্ধ্যার আগেই শাঁখরাইলের কাছে পৌঁছে যাব।'

'তার মানে সাতগাঁ পৌঁছতে কাল সেই বেলা এক পহর?'—

বলিতে বলিতে আর-একটি গোলগাল ভদ্রলোক সামনে আগাইয়া আসিলেন। লোকটি কিছু স্থূলোদর, আকৃতিতেও তেমন দীর্ঘ নন। কিন্তু মুখের দিকে তাকাইলে মনে হয় লোকটি রসিক এবং আমোদ-প্রিয়। গরম বেশি বোধ হওয়ায় গায়ের পিরানটি অর্ধেক খুলিয়া ফেলিয়াছেন। ছোট নেয়াপাতি ভুঁড়িটির উপর কাবেরীর জলপ্রপাতের মত সরু একগাছি পৈতা উঁকি মারিতেছে। ইনি সম্পর্কে মৃগাঙ্ক রায়ের শ্যালক। নাম রসরাজ।

মৃগাঙ্ক রায় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শ্যালকের দিকে চাহিলেন।

'না বাপু, আজ তাহলে শাঁখরাইলের কাছেই বজরা বেঁধো। যা জোর খিদে পেয়েছে! তোমার ঐ দুধ, দই আর কলা—ওসব সাত্ত্বিক আহার খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেল। এখন কিছু রাজসিক খাবার না হলে আর এক পাও চলতে পারব না। শাঁখরাইলের মাদারপাড়ায় নতুন চটি বসেছে। শুনেছি তোফা খাওয়ায়। গঙ্গার টাটকা ইলিশ-ভাজা আর মতিয়ার চরের মিহি চালের গরম গরম পোলাও—ওহ্!' রসরাজ ঠোঁটটা সরু করিয়া চুক করিয়া মৃদু শব্দ করিলেন।

মৃগাঙ্ক রায় হাসিয়া কহিলেন, 'এরই মধ্যে খিদে পেয়ে গেল! এই না দুপুরে এককাঁদি কলা গুণে গুণে শেষ করলে? সাত্ত্বিক খাবার হলেও ও তো আর সত্যি-সত্যি তোমার জ্যামিতির বিন্দু নয়। —তোমাদের জ্যামিতির ভাষায় তার অবস্থিতিও আছে, বিস্তৃতিও আছে;—আর ওজনেও কয়েক সের হবে বোধহয়!'

রসরাজ ভগিনীপতির দিকে তাকাইয়া মুখখানা এমন করিলেন, যেন তাঁর প্রতি করুণায় তাঁর মন ভরিয়া উঠিয়াছে। মুখে বলিলেন, 'ঐ তো তোমার দোষ! বাড়িতে যেদিন রাধামাধবের মন্দির বসিয়েছ সেদিনই বুঝেছি তোমার হয়ে এসেছে। আরে, এ যুগে কি ও সব বোষ্টুমি করলে চলে? এখন এসেছে নতুন যুগের নতুন হাওয়া। দেখছ না, জোর যার মুল্লুক তার? এখন আমাদের আরাধ্য

দেবী হবেন শুধু মা কালী। মাকে পাঁঠা খাওয়াবে, নিজে সেই মহাপ্রসাদ খাবে, তারপর দেখবে কী হয়! ওসব দই-কলা খেয়ে কি আর মগ-ফিরিঙ্গির সঙ্গে এঁটে ওঠা যায়! ফুঃ!'

'তা আপাতত তো তুমি মগ-ফিরিঙ্গির সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছ না!'

'বলা যায় কি? যে দিনকাল পড়েছে! নদীপথে যাওয়া মানেই তো লড়াই করতে যাওয়া।'

মৃগাঙ্ক রায় একটু থামিয়া বলিলেন, 'কিন্তু শুনেছি ফিরিঙ্গির উৎপাত হালে একটু কমেছে। গোয়ায় যে নতুন ফিরিঙ্গি রাজ-প্রতিনিধি এসেছে সে নাকি লোক বড় ভাল। দলের লোকদের ডাকাতি করা আর চলবে না।'

'ওই শুনেই খুশি থাকো। ডাকাতি বন্ধ করবে এইসব হার্মাদের দল? হ্যাঃ! গোয়ার রাজা গোয়ায় বসে যা খুশি হুকুম দিন, বাংলা মুলুকে কে-ই বা তা মানতে যাচ্ছে? তা ছাড়া ভদ্রলোক নতুন এ দেশে এসেছেন, তাই লম্বা-চওড়াই কথা বেরুচ্ছে! দু-দিন এখানে থাকুন, লুঠের ভাগ পান, তারপর দেখা যাবে কার দৌড় কত দূর!'

ভৃত্য আসিয়া রুপায় বাঁধানো গড়গড়া সামনে রাখিয়া গেল। মৃগাঙ্ক রায় আগ্রহের সঙ্গে আলবোলায় কয়েকটি টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিলেন। পাক খাইয়া খাইয়া সুগন্ধি ধোঁয়া গঙ্গার ঠাণ্ডা বাতাসে মিশিয়া যাইতে লাগিল।

মাঝি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হুজুর, শাঁখরাইল তো এসে পড়ল। বজরা কি তা হলে এখানেই বাঁধব?'

মৃগাঙ্ক রায় শ্যালকের দিকে চাহিলেন। রসরাজ কহিলেন, 'নিশ্চয় বাঁধবে। মাদারপাড়ার চটিতে যেতেই হবে। উঃ, ক-দিন মাছ না খেয়ে আছি!'

সম্মুখে একটি ছোট ঘাট। কিন্তু অনেকগুলি নৌকা সেখানে বাঁধা। নৌকার আকৃতি দেখিয়া বোঝা যায়, নানা জায়গা হইতে এ-

সব নৌকা আসিয়াছে—বোধহয় সবগুলিই শেষ পর্যন্ত সপ্তগ্রামে যাইবে।

রসরাজ বজরা হইতে নামিয়া পড়িলেন। মৃগাঙ্ক রায় নামিতে রাজি হইলেন না, বলিলেন, 'যাও, ইলিশ মাছ খেয়ে এস। কিন্তু দেখো, যেন বেশি রাত কোরো না। বজরা আর ঘাটে রাখব না। রাতেই ছেড়ে দেব। এ সব জায়গা শুনেছি তেমন সুবিধের নয়। রঙ্গলাল আর ফটিককে বরঞ্চ সঙ্গে নিয়ে যাও। আর ওদের তুজনকেই সঙ্গে আলো আর তলোয়ার নিতে বল। তোমার নিজের তো ওসব আসে-টাসে না—মা কালীর পোষ্যপুত্রই বটে!' বলিয়া তিনি মৃদু হাসিলেন। রসরাজ কাদা ভাঙিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন।

প্রায় তু-ঘণ্টা পার হইয়া গেল, রসরাজের আর উদ্দেশ নাই। মৃগাঙ্ক রায় ক্রমেই অধৈর্য হইয়া পড়িতেছেন। আজ রাত্রে রওনা না হইতে পারিলে সাতগাঁ পৌঁছিতে খুবই বিলম্ব হইবে,—হয়ত যে-জন্য যাইতেছেন কাল আর তা শেষ করিতে পারা যাইবে না। ফলে বাড়ি ফিরিতেও দেরি হইয়া যাইবে। বাড়িতে ছোট ছেলে জয়ন্তকে ধরিতে গেলে কন্যা সুশ্বেতার জিম্মায় রাখিয়া আসিয়াছেন। বয়সের তুলনায় একটু চালাক-চতুর হইলেও সেও তো ছেলেমানুষ—এখনও ভাল করিয়া কৈশোর পার হয় নাই। আর জয়ন্তটাও যা তুরন্ত হইয়াছে! বারো বছরের ছেলে, কিন্তু গ্রামখানা যেন চষিয়া বেড়ায়! দিবারাত্রি লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি লাগিয়াই আছে। আবার নাকি লুকাইয়া কোথায় লাঠি খেলাও শিখিতে যায়! কোন্‌দিন কোন্ গোঁয়ারের পাল্লায় পড়িয়া হয়ত মাথাটাই ফাটাইয়া আসিবে! সেদিনও তো কোথা হইতে চোট খাইয়া আসিয়াছে। একটু নজর দিতে না পারিলেই যত সব বিদঘুটে কাণ্ড! সুশ্বেতা অবশ্য ছোট ভাইকে শাসনে রাখিবার কসুর করে না, কিন্তু অমন তুরন্ত ছেলেকে আঁটিয়া ওঠা কি অতটুকু মেয়ের কাজ! তা ছাড়া তুষ্ট বুদ্ধিতে সে নিজেও তো ভাইয়ের চেয়ে কম যায় না! আর যা তেজী! লোকে বলে,

মৃগাঙ্ক রায় নাকি ছেলেমেয়েকে প্রশ্রয় দিয়া দিয়া এমন করিয়াছেন। কিন্তু লোকে কেবল শাসনটুকুই দেখে, মাতৃহীন ছেলেমেয়ে দুটি যে মায়ের স্নেহ পাইল না—তাই বাপকেই সাধ্যমত তা পূরণ করিতে হয়—এ খবর তো আর কেউ রাখে না।

মৃগাঙ্ক রায় ভাবিতেছিলেন। সুশ্বেতা বলিয়াছিল, জয়ন্ত নাকি আজকাল পাশের চন্দনা গ্রামের অপদার্থ ছোকরা জমিদার নন্দ চৌধুরীর সঙ্গে খাতির জমাইতে শুরু করিয়াছে। চৌধুরীদের সঙ্গে তাঁদের তিন পুরুষের ঝগড়া। নন্দর বাপ কন্দর্প চৌধুরীর আমলেও দুই দলের মধ্যে বহুবার দাঙ্গাহাঙ্গামা, লাঠালাঠি হইয়া গিয়াছে। তবু, কন্দর্প চৌধুরীর যত দোষই থাকুক, তিনি ছিলেন সাহসী, বীর—নিজে হাতে লাঠি ধরিতে পারিতেন, এবং লাঠি লইয়া দাঁড়াইলে বারোদীঘি গ্রামের ওস্তাদ লাঠিয়ালরাও অনেক সময় হিম্‌সিম্ খাইয়া যাইত। আর এ ছেলেটা নাকি হইয়াছে বিশ্বকর্মার ছেলে চামচিকা! না পারে লাঠি ধরিতে, না পারে কোন কাজের কাজ করিতে। কন্দর্প চৌধুরী ছেলেকে নাকি অনেক লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন, কিন্তু মানুষ করিতে পারেন নাই। এত অলস, এত কর্মবিমুখ এবং আরামপ্রয়াসী যুবক মৃগাঙ্ক রায় আর কোথাও দেখিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। দিবারাত্র বন্ধুবান্ধবের সহিত দাবা আর পাশা খেলা লইয়াই পড়িয়া থাকে, জমিদারির কাজকর্ম দেখাও প্রয়োজন বোধ করে না। বাপের আমলের নায়েব-গোমস্তারা যা খুশি করিতেছে, ভ্রূক্ষেপ নাই। নেশা ভাঙ করে কি না কে জানে, ভাবগতিক দেখিয়া করাটাই স্বাভাবিক মনে হয়। এই অপদার্থ যুবকটার কাছে ছেলেমানুষ জয়ন্ত যাতায়াত শুরু করিয়াছে শুনিয়া অবধি মৃগাঙ্ক রায়ের মনে আর শান্তি নাই। কে জানে, অদূর ভবিষ্যতে কী বিপদ তাঁদের দিকে ঘনাইয়া আসিতেছে! ভরসা শুধু রাধামাধব।

এদিকে রাত গড়াইয়া চলিয়াছে, কিন্তু রসরাজের দেখা নাই। লোকটা কি ইলিশ মাছের লোভে আজ ঐ মাদারপাড়ার চটিতেই

রাতটা কাটাইয়া দিবে নাকি! আচ্ছা ঝঞ্ঝাট বাপু! না কি, নতুন জায়গায় গিয়া কোন বিপদে পড়িল! এ সব মুখসর্বস্ব লোকগুলির অসাধ্য কিছুই নাই। কিছু করিবার একরত্তি ক্ষমতা নাই, কিন্তু মুখে লম্বা-চওড়া—যাকে বলে চটাং চটাং কথা—তার আর অভাব নাই! নেহাৎ শ্যালক বলিয়া মৃগাঙ্ক রায় কিছু মনে করেন না, অন্য লোক হইলে—

'গোবিন্দ!'—মৃগাঙ্ক রায় হাঁক দিলেন।

গোবিন্দ সামনে আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

'দেখ তো ছাদে উঠে, মামাবাবুর কোন হদিস পাওয়া যায় কি না!'

গোবিন্দ মাথা হেলাইয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটিয়া গেল, গোবিন্দের সাড়া নাই। মৃগাঙ্ক রায় আবার বাহিরে আসিলেন, 'গোবিন্দ, কিছু দেখতে পেলে?' এবার গোবিন্দের গলা শোনা গেল, 'আজ্ঞে হুজুর, ঐ বোধহয় আসছেন। অনেক দূরে একটা আলো দেখছি; এদিকেই এগুচ্ছে ...কিন্তু—ওঁর পেছনে আরও কতগুলি আলো কেন?—তাই তো, মস্ত বড় একটা দল বোধহয় এদিকে আসছে। ওরে বাবা, এ যে অনেকগুলি!'

আলোগুলি ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিতে লাগিল। মৃগাঙ্ক রায় হাঁকিলেন, 'গোবিন্দ, বন্দুক ঠিক রেখো; তবে, ওরা আক্রমণ না করলে গুলি ছুঁড়ো না। ভুলু সর্দার, লাঠি নিয়ে তৈরি থাক!'

বজরাসুদ্ধ লোক নিমেষে সচেতন হইয়া উঠিল। না জানি এখনই কোন্ বিপর্যয় কাণ্ড শুরু হইবে!

কিছুক্ষণের মধ্যেই মশালগুলি ঘাটের কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। কিন্তু না, প্রথমে যতটা বেশি লোক মনে হইয়াছিল আসলে তত

লোক নয়—সবসুদ্ধ পনেরো-কুড়ি জন হইবে। বেশির ভাগই দেশী লোক, তবে তার মধ্যে কয়েকজন আরাকানী এবং ফিরিঙ্গিও আছে। দলের আগে-আগে হাত তুলিয়া ভুঁড়ি দোলাইতে দোলাইতে যিনি আসিতেছেন তিনি আর কেউ নন—আমাদের পূর্বপরিচিত রসরাজ—মৃগাঙ্ক রায়ের শ্যালক।

রসরাজের চলিবার ভঙ্গী এবং মুখের হাবভাব দেখিয়া মৃগাঙ্ক রায় নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার আশঙ্কা তবে অমূলক।

রসরাজ বড় হাঁফাইয়া পড়িয়াছিলেন, বজরার উপর উঠিয়া একটু দম লইলেন, তারপর কহিলেন, 'রায়মশাই বুঝি ভয় পেয়ে গিয়েছিলে? তা তো পাবেই—যা দিনকাল পড়েছে! কিন্তু যা ভাবছ এঁরা তা নন। চটিতে আলাপ হল। সত্যিকারের ব্যবসায়ী এঁরা। হীরা-জহরতের কারবার করেন কিনা, তাই দেখাতে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম।'

মৃগাঙ্ক রায় একটু সন্দেহাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, 'কিন্তু এজন্য এত লোকজন—এত মশাল!'—

এবার জবাব দিল সঙ্গের একটি ফিরিঙ্গি যুবক। পরিষ্কার বাংলায় কহিল, 'আমরা নানারকম দামী অলঙ্কারের কারবার করি কিনা, তাই একটু সতর্ক থাকতে হয়, কখন কী বিপদ ঘটে বলা যায় না তো আজকাল!' তারপর একটু থামিয়া কহিল, 'বিদেশী দেখলেই আপনাদের ভয়-ডর লাগে, কিন্তু আমরা খাস পর্টুগাল রাজার লোক, ব্যবসা করতেই এ দেশে আসা,—অন্য দিকে নজর দেব কেন? ছিঃ!'

রসরাজ সায় দিয়া কহিলেন, 'ঠিকই তো। ব্যবসা মানে ব্যবসা। আপনাদের দেশের জিনিস এ দেশে বেচে যাবেন, আর এ দেশের জিনিস ও দেশে নিয়ে বেচবেন। এই তো ঠিক।' ভগিনীপতিকে কহিলেন, 'এঁদের কাছে চমৎকার চমৎকার সব হার, মালা আছে, নিয়ে চল না তোমার রাধামাধবের জন্য। সত্যিকারের জিনিস হবে একটা।'

মৃগাঙ্ক রায় একটু ইতস্তত করিয়া যুবককে বজরার ভিতরে আমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার চোখের ইঙ্গিত বুঝিয়া গোবিন্দ ও ভুলু সর্দার বাকি সকলকার দিকে নজর রাখিতে লাগিল।

যুবকের হাতে একটি ছোট পেটিকা। খুলিয়া ফেলিতেই মৃগাঙ্ক রায়ের চোখ যেন ঝলসাইয়া গেল! এ যে বহুমূল্য সব রত্ন! এ কিনিতে গেলে হয়ত কত বড়-বড় রাজা-মহারাজার রাজকোষই উজাড় হইয়া যাইবে! একধারে চার-পাঁচটা মালা কুণ্ডলী করিয়া জড়ানো ছিল। রসরাজ তারই একটি তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'এইটে।' একগাছি রত্নখচিত সোনার মটরমালা। কিন্তু সাধারণ মটরমালা নয়—দানাগুলি অসম্ভব রকম বড়, আর তার গায়ে অতি সূক্ষ্ম কারিকুরি। মৃগাঙ্ক রায় শ্যালকের হাত হইতে মালাগাছা তুলিয়া আঙুলে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিতে লাগিলেন। পিলসুজের আলো পড়িয়া মালার গা হইতে যেন আলোর ছুরি ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল। নাঃ, এ মালা শুধু রাধামাধবের গলায়ই মানায়!

যুবক হাসিয়া কহিল, 'নিয়ে নিন। এ জিনিস হামেশা পাওয়া যায় না। এর দাম পাঁচ হাজার আশরফি। আপনাকে কিছু কমিয়ে দিচ্ছি। কত মোহর দেবেন?'

অল্প দর-কষাকষি করিয়া মৃগাঙ্ক রায় মালাগাছি কিনিলেন। বজরার চোর-কুঠ্‌রিতে কিছু মোহর ছিল। তা বাহির করা হইল। যুবক মালা রাখিয়া পেটিকা বন্ধ করিল, তারপর অভিবাদন করিয়া সদলবলে চলিয়া গেল।

বণিকের দল চলিয়া গেলে মৃগাঙ্ক রায় মুগ্ধ চোখে মালাটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। শিল্পীর হাতের অপরূপ কাজ! মাঝের দানাটি সবচেয়ে বড়। তার গায়ে একটি ছোট ত্রিশূল-চিহ্ন। দেখিয়া দেখিয়া যেন তৃপ্তি হয় না! খানিকক্ষণ অভিভূত ভাবে চাহিয়া থাকিয়া মৃগাঙ্ক রায় হঠাৎ উঠিয়া হুকুম দিলেন, 'নৌকা ফেরাও। এখন আর সাতগাঁ যেতে হবে না, বারোদীঘির দিকে চালাও।' রসরাজকে

কহিলেন, 'এ জিনিস নিয়ে সাতগাঁ যাওয়া উচিত হবে না। আর, এ জিনিস রাধামাধবের গলায় না পরানো পর্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব না। কাজের একটু ক্ষতি হবে? তা হোক।'

বজরা আবার বিপরীত মুখে ভাসিয়া চলিল।

৩ **উৎসবের আয়োজন**

এখন যেখানে সুন্দরবন তার ঘনসন্নিবিষ্ট গাছপালায় দিকদেশ অন্ধকার করিয়া বিভীষিকার মত দাঁড়াইয়া আছে, বরাবর সেখানটা ঐরূপ ছিল না। এখন যেখানে গহন অরণ্য ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না—হিংস্র বাঘ, কুমির, সাপ বা অনুরূপ কতকগুলি দুরন্ত জানোয়ার বা পোকা-মাকড় ছাড়া অন্য জীবন্ত প্রাণী যেখানে টিকিতে পারে না— এমন একদিন ছিল যখন সেখানে বিস্তৃত জনপদ ছিল। বড় বড় পথঘাট, লোকালয় জনকোলাহলে গম্-গম্ করিত। গভীর জঙ্গলের মধ্যে বড়-বড় প্রাচীন অট্টালিকা, দীঘি প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ এখনও তার কিছু কিছু সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। হাস্যমুখর দক্ষিণ বাংলা মগ-ডাকাতের অত্যাচারে কেমন করিয়া শ্মশান হইয়া গেল—কেমন করিয়া চোখের সম্মুখে বড় বড় গ্রাম, নগর ধ্বংস হইয়া গভীর অরণ্যে পর্যবসিত হইল,—সে আর-এক কাহিনী।

আমি যখনকার কথা বলিতেছি তখনও সুন্দরবনের এ হাল হয় নাই। বড় বড় গ্রাম, লোকালয়ে তখনও সে দেশ পূর্ণ। সুন্দরবন তখন বাংলার সম্পদ। সমুদ্রের কাছাকাছি জঙ্গল যে একেবারে ছিল না তা নয়, কিন্তু সে আর কতখানি?

এই সুন্দরবনেরই এক অংশ বারোদীঘি গ্রাম। শোনা যায় বহু বছর আগে কোন এক স্বাধীন রাজার আমলে এখানে পাশাপাশি বারোটি দীঘি কাটানো হইয়াছিল—রাজার কীর্তি অক্ষয় করিয়া রাখিবার জন্য। সে রাজার কথা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে কিন্তু তাঁর কীর্তি বারোটি দীঘির চিহ্ন আজও রহিয়াছে। যদিও বছরের অন্যান্য

সময়ে এর অনেকগুলিই শুকাইয়া যায়, কিন্তু বর্ষাকালে কোন-কোনটায় এখনও জল থই-থই করে।

এই রকম একটি দীঘির ধারে 'গ্রামের বর্তমান জমিদার মৃগাঙ্ক রায়ের বাড়ি।

বিরাট বাড়ি। জমিদারির আয় মোটামুটি ভালই। তা ছাড়া জমিদারের প্রতাপও যথেষ্ট। আগেই বলিয়াছি, এই সময় সমস্ত বাংলা দেশ জুড়িয়া কেমন একটা বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল। ফলে জমিদারেরা স্ব-স্ব এলাকায় বেশ প্রবল হইয়া উঠিতেছিলেন। ইহাদের অনেকেরই নিজের নিজের লাঠিয়াল ছিল, বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ছিল এবং ধরিতে গেলে ছোটখাট এক-একটি সৈন্য-বাহিনীও অনেকে গড়িয়া তুলিতেছিলেন।

মৃগাঙ্ক রায়ের পিতা ও-অঞ্চলের বেশ ডাকসাইটে জমিদার ছিলেন। মৃগাঙ্ক রায় অবশ্য একটু বৈষ্ণব ধর্মের পক্ষপাতী, কিন্তু দরকার হইলে লাঠি-সোঁটা ব্যবহারেও অপারগ নন। রাধামাধব ইঁহারই গৃহবিগ্রহ।

গাঁয়ে রাধামাধবের মন্দির মৃগাঙ্ক রায়ই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বিগ্রহটি তাঁর গুরু প্রেমানন্দ স্বামী তাঁকে উপহার দেন। কালো কষ্টিপাথরে গড়া অপরূপ মূর্তি। অনেক দূর দেশ হইতে ভক্তেরা দেখিতে আসে। মন্দিরে নিত্য-পূজার ব্যবস্থা আছে। তা ছাড়া মন্দির-সংলগ্ন অতিথিশালায় পান্থ-অতিথিদের নিত্যসেবারও আয়োজন রহিয়াছে। পর্বোপলক্ষে হাজার হাজার ভক্ত আসিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে জড় হয়।

মৃগাঙ্ক রায় বিপত্নীক; কন্যা সুশ্বেতার উপরেই মন্দিরের এবং বিগ্রহের দেখাশোনার ভার, এবং এ ভার সে যেন মন-প্রাণ দিয়াই লইয়াছে। এমনি দেখিলে মনে হইবে মেয়েটি বুঝি কিছু চঞ্চলা এবং হয়ত কিছুটা প্রগল্‌ভাও বটে, কিন্তু রাধামাধবের সামনে আসিলে সে হয় ভিন্ন মানুষ।

মৃগাঙ্ক রায়ের বজরা যখন গ্রামে ফিরিয়া আসিল তখন বেলা

প্রায় দুপুর। মন্দিরের পূজা এবং ভোগ শেষ হইয়াছে, অতিথিশালায় প্রসাদ বিতরণও প্রায় শেষ হইতে চালল।

অসময়ে কর্তাবাবুর বজরা ফিরিতে দেখিয়া বাড়িতে সোরগোল পড়িয়া গেল। সুশ্বেতা মন্দিরের প্রাঙ্গণে ভোগ বিতরণের জায়গায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছিল, খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিল। মৃগাঙ্ক রায় বজরা হইতে নামিয়া মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মুখে তাঁর প্রসন্নতার ছাপ। কিছুক্ষণ নিমীলিত নেত্রে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তিনি অন্দরমহলের দিকে রওনা হইলেন।

সুশ্বেতা পথের মধ্যেই তাঁকে পাকড়াও করিল। 'এরই মধ্যে সাতগাঁ থেকে কী করে ফিরে এলে বাবা? তবে যে বলেছিলে, ফিরতে অনে-ক দেরি হবে?'

মৃগাঙ্ক রায় সস্নেহে কন্যার মাথাটা নাড়িয়া দিয়া কহিলেন, 'সাতগাঁ আর শেষ পর্যন্ত যাওয়া হল কই মা, রাধামাধব টেনে আনলেন যে!'

'রাধামাধব তো টেনে আনবেনই, কিন্তু সাতগাঁতেও তো তিনিই পাঠিয়েছিলেন! যাক গে, ব্যাপার কী বল না—খবর ভালো তো?'

'হ্যাঁ রে পাগলি, খবর ভাল বৈকি! রাধামাধব কি আর অমনি টেনে এনেছেন? চল, ঘরে চল, বলছি।'

কয়েকজন ভৃত্য একটি ছোট তোরঙ্গ আনিয়া হাজির করিল। 'ঐ ঘরে'—বলিয়া মৃগাঙ্ক রায় কন্যাকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন।

সুশ্বেতার বিস্ময়ের আর অবধি নাই। এ যে সাত রাজার ধন মাণিকের মতই পরম সামগ্রী! বাবা এ অদ্ভুত সামগ্রী কোথা হইতে খুঁজিয়া আনিলেন!

মৃগাঙ্ক রায় মৃদু-মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিলেন, 'এ মালা কাকে দেওয়া যায় বল্ তো?'

ততোধিক হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করিয়া মেয়ে জবাব দিল, 'কেন,

আমাদের রাধামাধবকে! নিশ্চয়ই তাই, নয় বাবা?'

মৃগাঙ্ক রায় পুনরায় হাসিয়া কন্যার থুৎনি ধরিয়া নাড়িয়া দিলেন। কহিলেন, 'আমার মা নইলে মনের কথা এমন করে কে বলে দেবে?—কিন্তু জয়ন্ত গেল কোথায়? তাকে দেখছি না তো!'

সুশ্বেতা চুপ করিয়া রহিল।

'খেয়ে-দেয়ে উঠেই এই রোদ্দুরে বেরিয়েছে বুঝি? নাঃ, ওকে নিয়ে আর পারি না! কোথায় গেছে জানিস?'

সুশ্বেতা কথা কহিল না। মৃগাঙ্ক রায়ের মুখ এবার গম্ভীর হইল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি কহিলেন, 'চন্দনার হতভাগাটার কাছে গেছে—নয়?'

সুশ্বেতা পিতাকে দেখিয়া এই প্রশ্নটিরই আশঙ্কা করিতেছিল। জয়ন্ত যে পাশের গ্রামের নন্দ চৌধুরীর কাছে যাতায়াত করে—তা তাহার বাবা পছন্দ করেন না, সুশ্বেতার তাহা ভাল রকমই জানা আছে! সে নিজেও সেই অপদার্থ জমিদারটিকে দেখিতে পারে না। কিন্তু তার ভাই জয়ন্ত যে কিসের লোভে ফাঁক পাইলেই সেখানে ছুটিয়া যাইতে চায়, সুশ্বেতা কিছুতেই তাহা বুঝিতে পারে না। ভাইকে সে বহুবার নিষেধ করিয়াছে, ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছে। —কিন্তু তর্জন-গর্জন, ভীতি, কিছুই ছেলেটাকে নিরস্ত করিতে পারে নাই। বরঞ্চ ফল বিপরীতই হইয়াছে, জয়ন্ত আজকাল দিদিকেও লুকাইয়া সেখানে যাতায়াত শুরু করিয়াছে। সুশ্বেতা অবশ্য সুযোগ পাইলেই ভাইকে পিতার শাসন হইতে আড়ালে রাখিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সীমা ছাড়াইয়া গেলে সে কী করিবে? বাপের কাছে তো আর মিছা কথা বলা চলে না! বাবা সাতগাঁ যাওয়ায় সুযোগ পাইয়া জয়ন্ত যেন বড় বাড়াবাড়ি শুরু করিয়াছিল। বেশ হইয়াছে, বাবা আজ হঠাৎ আচমকা আসিয়া পড়িয়াছেন।

মৃগাঙ্ক রায় কিন্তু কথাটা লইয়া অন্যান্য দিনের মত বেশি চেঁচামেচি করিলেন না, কিন্তু তাঁর মুখ দেখিয়া বেশ বোঝা গেল

তিনি যথেষ্ট বিরক্ত—বুঝি বা একটু বিচলিতই হইয়াছেন।

'বাঃ বাঃ, বাপ-বেটিতে তোফা আলাপ জমিয়েছ দেখছি! আর এদিকে আমি পেটে হাত দিয়ে বসে আছি! আজ আর খাওয়া-দাওয়া হবে না বলেই যেন মনে হচ্ছে?'

রসরাজের আবির্ভাবে অন্য প্রসঙ্গের সুযোগ পাইয়া সুশ্বেতা যেন বাঁচিয়া গেল। কহিল, 'কেন মামা, পথে বুঝি কিছু খাও নি তোমরা?'

'কেন খাব না? স্রেফ বিশুদ্ধ গঙ্গোদক খেয়ে খেয়ে পেট একেবারে আইঢাই করছে!'

মৃগাঙ্ক রায় এবার কথা কহিলেন। হাসিয়াই কহিলেন, 'ও কথা বোলো না। আজ সকালেও তোমার জন্য বেনেপুকুর থেকে এক-ঝুড়ি খাবার কিনে দিয়েছি। তা ছাড়া কালকের রাতের ইলিশ মাছের কথা বুঝি এর মধ্যেই ভুলে গেলে?'

'ঐ দেখ, আমার ইলিশ মাছ খাওয়াটাই শুধু দেখেছ! আরে ইলিশের সন্ধানে না গেলে তোমার ঐ রত্নহারটি আসত কোথা থেকে বল দেখি?—জানিস সুশি, ভাগ্যিস আমি শাঁখরাইলের কাছে নেমেছিলাম! ফিরিঙ্গিগুলোর সঙ্গে তো আমিই প্রথম ভাব করি। ব্যাটারা তো জীবনে কোনদিন ইলিশ মাছ চোখে দেখে নি—সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর ধারে কোন্ শুঁটকি মাছ খেয়ে ভাবে, না জানি কী খেলাম! চটিতে গিয়ে দেখি, পেঁটরা থেকে কি-সব খুলে মুখে পুরছে। একটাকে থামিয়ে বললাম,—কী-সব ছাইভস্ম খাচ্ছ? চেখে দেখ আমাদের বাংলা দেশের আসল চীজ—তাজা ইলিশ! সাত পুরুষ পর্যন্ত জিভে সোয়াদ লেগে থাকবে। ঐ খেয়েই না বেটা গলে গেল, আর শেষ পর্যন্ত ভাব জমিয়ে বজরা পর্যন্ত এল এগিয়ে!'

সুশ্বেতা বাধা দিয়া কহিল, 'সেজন্যে ধন্যবাদ! কিন্তু তোমার ভয় নেই মামা, খাবার আয়োজন সবই তৈরি আছে। প্রসাদ তো আছেই, আর তোমার মাছেরও অভাব হবে না। এই একটু

আগেই কৈবর্তপাড়ার সুদাম এসে জিজ্ঞেস করছিল মামাবাবু ফিরেছেন কি না। তাদের জালে নাকি আজ ভীষণ মাছ পড়েছে, মামাবাবুকে নিবেদন না করে খেতে চায় না। তুমি নেই শুনে মুখটি চুন করে চলে গেল।' তারপর রসরাজের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, 'কিন্তু তোমাকে তাই বলে মুখ চুন করে থাকতে হবে না, আমি এখনই খবর পাঠাচ্ছি, এক দণ্ডের মধ্যে ভাজা মাছ পাতের সামনে নিয়ে খেতে বসতে পারবে।'

সুশ্বেতা বেণী দোলাইয়া ছুটিয়া পলাইল। মৃগাঙ্ক রায় সস্নেহে সেদিকে তাকাইয়া কহিলেন, 'মেয়েটা এখনও একেবারে ছেলেমানুষই রয়ে গেল!' শ্যালকের দিকে চাহিয়া কহিলেন, 'খাওয়া-দাওয়া করে একটু জিরিয়ে নাও, তারপর একবার এস; ঠাকুরমশায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা উৎসবের আয়োজন করতে হবে।'

উৎসবের পরে

কয়েক দিনের মধ্যেই উৎসবের আয়োজন সম্পূর্ণ হইল। এ কয়দিন বারোদীঘি গ্রামের লোকদের যেন আর অবসর নাই। খোদ জমিদার বাড়ির উৎসব, গ্রামসুদ্ধ লোক কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছে।

ভটচাজ মশায় বলিয়াছেন, আগামী সংক্রান্তির দিনটি বড় শুভ। একসঙ্গে অনেকগুলি নক্ষত্রের সেদিন যোগাযোগ ঘটিবে। তাই সংক্রান্তির দিনেই মন্দিরে উৎসবের আয়োজন করা হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে সেই সংক্রান্তি আসিয়া পড়িল। মৃগাঙ্ক রায় বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া ছিলেন। ঠাকুরের কাজ, ভালোয় ভালোয় হইয়া গেলে তবে নিশ্চিন্ত। আজ সারাদিন তিনি উপবাস করিবেন। দেশ-বিদেশ হইতে অতিথি অভ্যাগত, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেছেন, তাঁদের তত্ত্বতল্লাসের ব্যবস্থা করিয়া, খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া

দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিয়া তবেই তিনি জলগ্রহণ করিবেন। তাঁর দেখাদেখি সুশ্বেতাও আজ কিছু খাইবে না; জয়ন্তের জন্যও সেই ব্যবস্থা হইয়াছে।

একটু বেলা বাড়িতেই জমিদার-বাড়ি, বিশেষত মন্দিরের দিকটা সরগরম হইয়া উঠিল। থাকিয়া থাকিয়া ঢাকের বাদ্য, কাঁসরের ঢংঢং এবং শাঁখের শব্দে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। সেই সঙ্গে উৎসাহী গ্রামবাসীদের কোলাহলের তো কথাই নাই!

উঠানের একপাশে বিরাট চন্দ্রাতপ। তার উপর পুরু গালিচা পাতা। ধূপ-ধুনার গন্ধে বাতাসের মধ্যেও যেন কেমন উন্মাদনা লাগিয়া গিয়াছে। সেই গালিচার উপর নানা বয়সের নানা আকারের অসংখ্য পণ্ডিত বসিয়া। কাহারও কেশ তুষারশুভ্র, কাহারও চুলে সবে পাক ধরিয়াছে. কাহারও একেবারেই কাঁচা; আবার এমনও অনেকে আছেন যাঁদের চুলের কোন বালাই-ই নাই, সমস্তটাই মুণ্ডিত বা বিল্বসদৃশ টাকে ঢাকা। তবে, সকলেরই মাথায় ছোট-বড় নানা আকারের শিখা,—বাতাসে অবিরাম দুলিতেছে। আর সেইসঙ্গে উড়িতেছে রাশি রাশি কড়া নস্য আর সুগন্ধি তামাকের ধোঁয়া। উড়ানির ফাঁকে ফাঁকে গুচ্ছ-গুচ্ছ উপবীতও দূর হইতে দর্শকের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম সৃষ্টি করিতেছে। পণ্ডিতেরা কেহ বা শাস্ত্র লইয়া তর্ক করিতেছেন, কেহ বা দক্ষিণার পরিমাণ লইয়া গবেষণা করিতেছেন। ছোকরা পণ্ডিতেরা কেহ কেহ আড়ালে হাসি-তামাসা করিতেও ছাড়িতেছেন না।

আর-একদিকে বসিয়াছেন বৈষ্ণবের দল। ইঁহাদের সকলেরই মস্তক মুণ্ডিত, কপালে দীর্ঘ তিলক, এবং প্রায় সকলেরই হাতে খোল বা করতাল। কীর্তনের শব্দে এ দিকটি মুখরিত।

অন্য দিকে বসিয়াছেন বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরা—আশপাশের গ্রামের সম্ভ্রান্ত লোকেরা সকলেই প্রায় আছেন। সেখানেও পান-তামাকের বাহুল্য দেখা যাইতেছে।

রাধামাধব আজ নূতন সাজে সাজিয়াছেন। ফুলে ফুলে সমস্ত মন্দিরটি যেন ছাইয়া গিয়াছে। সামনে পিছনে পাশে—সর্বত্র সুগন্ধি ফুলের মালা ঝুলিতেছে। মন্দিরের ভিতরে নিপুণ শিল্পীর হাতে গড়া অপরূপ মূর্তি। মূর্তির মুখে প্রসন্ন হাসি। কণ্ঠে দুলিতেছে মৃগাঙ্ক রায়ের আনা সেই অপূর্ব রত্নমালা। মাথার উপর বিরাট আলোর ঝাড় হইতে টুকরা টুকরা আলো আসিয়া সেই মালার উপর পড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে যেন তা সহস্র টুকরা হইয়া চারিদিকে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। ভক্তেরা আসিতেছে, সামনে লুটাইয়া পড়িতেছে, পরক্ষণেই অপরকে জায়গা করিয়া দিতে হইতেছে। আজ আর যেন দর্শনপ্রার্থীর শেষ নাই!

রসরাজের মনটাও আজ বেশ খুশি হইয়া আছে। তবে একটা দুঃখ, আজ আর খাদ্য-তালিকায় কোন রকম আমিষের ব্যবস্থা নাই। মাছ-মাংস বাদ দিয়া যে কেমন করিয়া একটা বড়দরের ভোজ হইতে পারে, তা তাঁর বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু যাই হোক, এমন দিনেও প্রসঙ্গ যে মৃগাঙ্ক রায়ের কাছে একেবারেই আমল পাইবে না তা সকলেই জানে, রসরাজও জানিতেন। কাজেই তিনি তার বদলে যতটুকু অন্য ব্যবস্থা করা যায় তাহারই চেষ্টায় আছেন। পাকশালার তদারকের ভার তাঁহাকে দেওয়া না হইলেও তিনি যাচিয়াই লইয়াছেন। বিশেষত হালুইকরেরা যেখানে বড় বড় রসের কড়াই চাপাইয়া হল্লা করিতেছে, তদারকটা যেন ঘন-ঘন সেইদিকেই হইতেছিল। তিনি ক্ষীরমোহন, আমৃত্তি, চম্‌চম্‌ প্রভৃতি বার বার চাখিয়া দেখিতেছিলেন বিশিষ্ট অতিথিদের পাতে ও-জিনিস দেওয়া যায় কি না।

সুশ্বেতার আজ আর বিশ্রাম নাই। চর্কিবাজির মত সারা বাড়িটা সে আজ চষিয়া বেড়াইতেছে। সম্পর্কে মাসি-পিসি-জেঠি প্রভৃতির অভাব জমিদার-বাড়িতে কোনকালেই থাকে না, এ বাড়িতেও ছিল না।—কিন্তু না থাকিলে কী হয়, ছোট্ট সুশ্বেতাই যেন বাড়ির গিন্নি! যেদিকে সে নজর দিবে না সেইদিকেই গোলমাল। তার মত.

মেয়েদের সাধারণত অন্দর-মহলেই থাকিবার কথা—বাহিরে বাহির হওয়ার রেওয়াজ বড় নাই, কিন্তু সুশ্বেতা কোনকালেই তা গ্রাহ্য করে না, সর্বত্রই তার অবাধ গতি। জমিদারের আদরের কন্যা, কেহ কিছু বলিতে সাহস পায় না।

সুশ্বেতা কি একটা কাজে ঘরে আসিতেছিল, মনে হইল খাটের আড়ালে কিসের একটা মৃদু কড়-মড় আওয়াজ হইতেছে। কাজ চুলায় গেল, সুশ্বেতা পা টিপিয়া টিপিয়া খাটের দিকে অগ্রসর হইল।

জয়ন্ত নিরিবিলি দাঁড়াইয়া টপাটপ কি মুখে পুরিতেছিল, আচমকা সুশ্বেতার আবির্ভাবে থতমত খাইয়া গেল।

'কী খাচ্ছিস এখানে লুকিয়ে লুকিয়ে? আজ না তোর উপোস করবার কথা?'

'বা-রে, আমার বুঝি খিদে পায় না! সেই কাল রাতে খেয়েছি, আর আজ এত বেলা হল—এখনও একফোঁটা—'

'তাই বলে অতিথ-বিতিথের আগে তুই খেয়ে নিবি? খুব শিক্ষা হচ্ছে তো?'

জয়ন্ত প্রথমটা আমতা আমতা করিতে লাগিল, তারপর হঠাৎ ঝাঁঝের সঙ্গে কহিল, 'বেশ করব চুপি-চুপি খাব। ভারি তো অতিথির বহর! চাল নেই, চুলো নেই, পেটে হয়ত সাতটা কিল মারলেও একটা সংস্কৃত শ্লোক বেরোবে না! শুধু মাথায় একটা টিকি থাকলেই হলেন মস্ত পণ্ডিত! ওদের জন্য উপোস করে মরতে যাব কেন, দায় পড়েছে আমার!'

সুশ্বেতা বুঝিল জয়ন্তের রাগ কোথায়। 'ও, বুঝেছি, তোর সেই অপদার্থ বন্ধুটিকে বুঝি নেমন্তন্ন করা হয় নি?'

জয়ন্ত ফাটিয়া পড়িয়া কহিল, 'তার দায় পড়েছে এখানে আসতে।' তারপর একটু থামিয়া কহিল, 'আমার বন্ধু হতে যাবে সে কোন্ দুঃখে? যা যা, বিরক্ত করিস নে, উপোস কর্ গে যা।'

সুশ্বেতা নড়িল না, 'হুঁ, এতটা বন্ধুপ্রীতি ভাল নয়। তা তোর

বন্ধুটি তো শুনেছি বিত্তের জাহাজ, তবে অমন সুনাম জোটাল কোত্থেকে? তার সম্বন্ধে তো অনেক খবরই শোনা যাচ্ছে!'

জয়ন্ত এবার কি ভাবিল, তারপর সুশ্বেতার বেণী ধরিয়া টান দিয়া দুষ্টু হাসি হাসিয়া কহিল, 'শোন্ তবে আর একটা খবর, এটা আরও নতুন। নন্দ চৌধুরী নাকি ঘটক পাঠিয়েছে বাবার কাছে, বিয়ের প্রস্তাব করে।'

সুশ্বেতা ঠোঁট উল্টাইয়া কহিল, 'হনুমান তো কোনদিন বিয়ে করেছিল বলে শুনি নি, তোর বন্ধুর আবার এ মতি-গতি হল কেন?'

রাত্রি প্রথম প্রহর পার হইয়া গিয়াছে, বারোদীঘির গ্রাম নিঝুম, নিস্তব্ধ। সেই অন্ধকারে নদীবক্ষে কয়েকখানি ছিপ বিদ্যুৎগতিতে আগাইয়া আসিতেছিল। গ্রামের সন্নিকটে আসিতেই সামনের ছিপ হইতে কে একজন হাঁকিয়া উঠিল, 'আস্তে,—এইখানে।'

ছিপ আসিয়া পারে ভিড়িল। সড়কি, লাঠি, বন্দুক হাতে ছায়ামূর্তির মত দলে দলে লোক আসিয়া ডাঙায় নামিল।

একজন মোটাসোটা প্রৌঢ় লোক—গায়ে দামী পোশাক, দেখিয়া মনে হয় দলের সর্দার, হাঁকিয়া কহিল, 'কেমন হে বিব্বু, জায়গা ভুল হয়নি তো?'

বিব্বু জবাব দিল, 'আজ্ঞে না হুজুর, ঐ তো সেই তেমাথা খাল। এখন এখানে একটু জিরিয়ে নিয়ে, ঝোপ বুঝে কোপ দিলেই হবে। দুজন লোক গাঁয়ের ভিতর গিয়ে একটু খবর নিয়ে আসুক না।'

সর্দার উত্তর দিল, 'আরে থাম থাম, তুমিও যেমন! এসেছ তো বোষ্টমের বাড়ি লুটতে, তার আবার অত ভয়! একটা ফাঁকা আওয়াজ করলে সুড়-সুড় করে সব পালাতে পথ পাবে না!'

দলের ভিতর হইতে কে একজন ফিশ্-ফিশ্ করিয়া কহিল,

'না-হে, যতটা সহজ ভাবছ তা নয়। এ সুন্দরবনের বোম্বেটে, এদের হাতে মাঝে মাঝে লাঠিও ঘোরে।'

'কে—কে বলে এ কথা?'—সর্দার গর্জন করিয়া উঠিল। কিন্তু এবার আর কেহ উত্তর দিল না।

সারাদিন পরিশ্রমের পর মৃগাঙ্ক রায় সবে শয্যাগ্রহণ করিয়াছেন; বাড়ির আর সকলেও বিশ্রাম করিতে গিয়াছে। হঠাৎ সদর দরজায় একটা সোরগোল শোনা গেল। মৃগাঙ্ক রায় ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিলেন, পরক্ষণেই চারিদিকে ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে শোনা গেল, 'ডাকাত—ডাকাত!'

জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন ছিল না, চোখের সামনেই দেখা গেল—দূরে জঙ্গল ভেদ করিয়া দলে দলে মশাল এই দিকেই আগাইয়া আসিতেছে।

'হুজুর!' মৃগাঙ্ক রায় ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁর লাঠিয়াল-সর্দার ভীমরাজ। 'হুজুর হুকুম দিন, বেটারা এদিকে আসবার আগেই ঠাণ্ডা করে দিয়ে আসি।'

মৃগাঙ্ক রায় চিন্তিত কণ্ঠে কহিলেন, 'তা তো বুঝি, কিন্তু আজ রাধামাধবের অর্চনার দিনেই…'

তাঁর কথা শেষ হইবার আগেই দূরে বন্দুকের গর্জন শোনা গেল। তবে কি এরা ফিরিঙ্গি ডাকাত?'

কিন্তু বেশিক্ষণ চিন্তা করিবার ছিল না, একটু পরেই ডাকাতের দল জমিদার-বাড়িতে ঝাঁপাইয়া পড়িল,—তাদের লক্ষ্য রাধামাধবের মন্দির।

৫ লাঠি বনাম বন্দুক

ফিরিঙ্গি ডাকাতের দল; তাদের সঙ্গে রহিয়াছে কয়েকটি ভীষণদর্শন মগ। আর আছে বর্শা, সড়কির সঙ্গে হাতিয়ার বন্দুক।

দেব-দ্বিজের প্রতি তাদের কোন শ্রদ্ধা নাই, দলপতির হুকুম পাইলে মন্দির ভাঙিয়া গুঁড়াইয়া দিতেও তারা দ্বিধা করিবে না। মৃগাঙ্ক রায় আজ বড় শক্ত পাল্লায় পড়িয়াছেন।

কিন্তু কেন? দেবমন্দিরের প্রতি ফিরিঙ্গিদের এ অহেতুক বিদ্বেষের কারণ কী? মৃগাঙ্ক রায় অনেক ভাবিয়াও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। যে রত্নহার আজ দেবতাকে নিবেদন করিয়াছেন কারণ হয়ত তাহাই। কিন্তু সে হার তো ফিরিঙ্গিরাই তাঁকে দিয়াছে। যাচিয়া, ন্যায্য দাম লইয়া দিয়াছে। বিক্রি করিয়া কয়েকদিন পরেই আবার তা কাড়িয়া লইবার কী কারণ থাকিতে পারে? নাকি, তারা মৃগাঙ্ক রায়ের ধনদৌলত সম্বন্ধে একটা বড় ধারণা করিয়া লইয়াছে, আজ অসতর্ক অবস্থায় তাই লুটিয়া লইতে চায়?

কিন্তু ভাবিয়া নষ্ট করিবার মত সময় ছিল না। রাধামাধবের মন্দির ফিরিঙ্গিরা আসিয়া কলুষিত করিবে, মৃগাঙ্ক রায় বাঁচিয়া থাকিতে এ হইতে পারে না। এজন্য বৈষ্ণব-মন্দিরে যদি রক্তস্রোত বহাইতে হয় তাও ভাল। ঠাকুরের ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না। ভীমরাজকে লাঠি চালাইবার আদেশ দিয়া মৃগাঙ্ক রায় নিজে বন্দুকের খোঁজে ঘরের দিকে ছুটিলেন।

শুরু হইল লাঠি ও বন্দুকের লড়াই। তেল-খাওয়া পাকান বাঁশের লাঠি, দেখিতে নিতান্তই নিরীহ তার চেহারা; কিন্তু উপযুক্ত হাতে পড়িলে সেই লাঠিই যে কী অসাধ্য সাধন করিতে পারে সে-যুগের বাঙালীদের তা অজানা ছিল না। ফিরিঙ্গিরাও কিছু কিছু টের পাইল। মাত্র শ-খানেক লাঠিয়াল লইয়া ভীমরাজ মন্দির রক্ষায় নামিয়া পড়িল। ফিরিঙ্গিদের সকলকার হাতে বন্দুক ছিল না। যাদের ছিল তারাও ভিড়ের মধ্যে ভাল করিয়া বাগাইয়া ধরিবার সময় পাইল না। মুহূর্তে মুহূর্তে বজ্রহস্তের এক-একটি লাঠির ঘা আসিয়া কব্জির উপর পড়িতে লাগিল—বন্দুক ছিটকাইয়া পড়িল। যে নিচু হইয়া তুলিতে গেল, লাঠির দ্বিতীয় আঘাতে তাকে আর উঠিতে হইল না।

কিন্তু ডাকাতের সংখ্যা বারোদীঘির লাঠিয়ালের চেয়ে বেশি এবং লাঠি ধরিতে জানে এমন লোক তাদের মধ্যেও ছিল। এবার তারাই আসিল আগাইয়া। সর্দারের নির্দেশমত বন্দুকধারীরা পিছাইয়া গিয়া তাদের পথ করিয়া দিল, সুযোগ মত অপর দিক হইতে তারা বন্দুক চালাইবে। লাঠির শব্দে, হিংস্র চীৎকারে ও আহতের আর্তনাদে সারা গ্রামখানি যেন কাঁপিতে লাগিল, রক্তের স্রোতে মন্দিরের উঠান ভাসিয়া গেল।

মৃগাঙ্ক রায় বন্দুক লইয়া বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে সুবিধা করিতে পারিতেছিলেন না। ডাকাতেরা যে কারণে বন্দুক ছুঁড়িবার সুবিধা পাইতেছিল না তাঁরও অবস্থা ছিল তাই। ছুঁড়িলে শত্রুদের সঙ্গে নিজেদের লোকদেরও আহত হইবার সমূহ আশঙ্কা। দুই দলে এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে আলাদা করিয়া বাছিয়া নিশানা করা সম্ভব নয়। ডাকাতরাও বোধহয় এতটা বাধা পাইবে ভাবিতে পারে নাই ; পারিলে সামনে না আগাইয়া প্রথম হইতেই বন্দুকের আক্রমণ শুরু করিত। একটু ভয় দেখাইতে পারিলে হয়ত একরকম বিনা বাধায়ই মন্দির দখল করিতে পারিবে এই রকম একটা ধারণা লইয়াই তারা আসিয়াছিল। কিন্তু দেখা গেল তা নয়, বৈষ্ণবরাও লাঠি ধরিতে জানে।

এদিকে অন্দর-মহলেও কম আতঙ্কের সৃষ্টি হয় নাই। ডাকাতেরা যদি মন্দির ছাড়িয়া এদিকে আক্রমণ শুরু করে তবে খুবই ভয়ের কথা। ফিরিঙ্গি দস্যুর অসাধ্য কিছুই নাই। মৃগাঙ্ক রায় তাই কয়েকজন বিশ্বাসী ও বলিষ্ঠ লাঠিয়ালকে এখানে মজুত রাখিয়াছেন,-- দরকার হইলে যারা অন্য অস্ত্রও ব্যবহার করিতে জানে। নিজে তিনি এদিকে নজর রাখিয়াছেন, রসরাজকেও এদিকে রাখিয়াছেন। মেয়েরা ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে, বর্ষীয়সীরা তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মধ্যে যাঁকে যাঁর পছন্দ—যাঁর প্রতি যাঁর বেশি বিশ্বাস, তাঁহারই নাম জপিতেছেন।

'বাবা!'—মৃগাঙ্ক রায় চমকাইয়া ফিরিয়া দেখিলেন, সুশ্বেতা। সুশ্বেতা অন্দর-মহলের দরজা ঈষৎ ফাঁক করিয়া তাঁকে ডাকিতেছে। মুখ তার উদ্বেগে শাদা হইয়া গিয়াছে।

'তুই—তুই!—তুই এখানে? শীগগির ভিতরে যা।—যা—যা—যা বলছি!' মৃগাঙ্ক রায়কে এত উত্তেজিত হইতে সুশ্বেতা বড় একটা দেখে নাই। কিন্তু তার যা বলিবার না বলিয়াই বা সে যায় কেমন করিয়া? মৃদুকণ্ঠে কহিল, 'যাচ্ছি,—কিন্তু জয়ন্তকে তো দেখছি না? ও গেল কোথায়?'

'জয়ন্তকে দেখছিস না! বলিস কী?' মৃগাঙ্ক রায় আবার চমকাইয়া উঠিলেন। 'ঘরের মধ্যেই তো শুয়ে ছিল, ভাল করে দেখ।'

'দেখেছি, খুব ভাল করে খুঁজে দেখেছি। ভেতরে কোথাও নেই। বাইরে গোলমালের মধ্যে যায়নি তো?'—কান্নায়, আশঙ্কায় সুশ্বেতার গলা ধরিয়া আসিল।

মৃগাঙ্ক রায় হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। এমন সময় জয়ন্তকে পাওয়া যাইতেছে না! এখন তিনি কী করিবেন? এই বিপদের সময় তাকে খুঁজিয়া বেড়ান অসম্ভব। হয়ত পাওয়া যাইবেই না—উপরন্তু এদিকেও সর্বনাশ হইয়া যাইবে। তাঁর হাতের বন্দুকও যেন খসিয়া আসিতে লাগিল।

সহসা তুমুল শব্দে জমিদার-বাড়ির একটি জানালা ভাঙিয়া পড়িল। বন্দুকের গুলি লাগিয়াছে। অর্থাৎ দস্যুদের একটা দল নিশ্চয়ই বন্দুক লইয়া আম-বাগানের পথ ধরিয়াছে,—মন্দির ছাড়িয়া এবার হয়ত জমিদার-বাড়ি আক্রমণের চেষ্টা করিবে। ওদিক হইতে বন্দুক না চালাইলে গুলি এদিকে আসিতে পারে না। এখনই তাদের পথরোধ করিতে না পারিলে আর রক্ষা নাই।

এদিকে ভীমরাজ তার দলবল লইয়া ক্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়িতে-ছিল। আর বেশিক্ষণ যে তারা ডাকাতদের ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে

এমন মনে হয় না। ভীমরাজ নিজেও আহত হইয়াছে, মাথা ফাটিয়া দর-দর ধারায় রক্ত গড়াইতেছে। আর কতক্ষণ যুঝিবে? মৃগাঙ্ক রায়ের সুশিক্ষিত লাঠিয়ালদের সকলকেই বুঝিবা আজ রাধামাধবের মন্দিরের নিচে বিসর্জন দিতে হয়!

আম-বাগানের পথের সন্ধান দিয়াছিল বিব্বু। বিব্বু দুরন্ত মগ। এ অঞ্চলের আনাচে-কানাচের সঙ্গে তার পরিচয়। ফিরিঙ্গি দস্যুদের সঙ্গেও তার ভারি খাতির। আম-বাগানের পথটা আঁকিয়া বাঁকিয়া জমিদার-বাড়ির পিছনে বারোদীঘির সেই প্রাচীন দীঘিগুলির একটিতে গিয়া শেষ হইয়াছে। এ দীঘিটিতে অবশ্য এখন আর জল নাই, শুষ্ক জঙ্গল হইয়া পড়িয়া আছে। কিন্তু এর পাশেই আছে একটি ভগ্নস্তূপ—কোন প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ। কোন রকমে এইটির উপর গিয়া উঠিতে পারিলে দস্যুদের ভারি সুবিধা হইবে। মৃগাঙ্ক রায়ও দস্যুদের মতলব আন্দাজ করিতে পারিয়াছিলেন! এদের পথের মধ্যেই প্রতিরোধ করিতে না পারিলে সমূহ ভয়ের কথা। দুর্ভাবনায় ক্ষণিকের জন্য জয়ন্তের কথাও বুঝি তিনি ভুলিয়া গেলেন।

আম-বাগানের পথে যাইতে অপর কোন বাধা ছিল না—বাধার মধ্যে, এদিকটায় সাপের উপদ্রব একটু বেশি। নিতান্ত দায়ে না পড়িলে পথটা বড়-একটা কেহ ব্যবহার করে না, সারা বছর জঙ্গল হইয়াই থাকে। সাপের কথা বিব্বুরও অজানা ছিল না। ফিরিঙ্গি সর্দারের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া আগাইবার প্রস্তাব সে তাই পছন্দ করিল না,—মশালের আলোয় ভাল করিয়া পথ দেখিয়া না চলিলে হিতে বিপরীত হইবার আশঙ্কা আছে। অগত্যা দস্যুদল মশালের আলোয় আম-বাগান আলো করিয়া অগ্রসর হইল। বিব্বু আগে আগে চলিল।

কিন্তু বেশি দূর যাইতে হইল না হঠাৎ বিব্বু একটা তীব্র আর্তনাদ করিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িল। তারপর আর একজন। ব্যাপার দেখিয়া পিছনের কয়েকজন ফিরিয়া দাঁড়াইল। তার পরই দেখা গেল

সুসংবদ্ধ দলের মধ্যে একটা প্রবল বিশৃঙ্খলা শুরু হইয়াছে, এবং যে যেদিকে পারিতেছে ছুটিয়া পালাইবার চেষ্টা করিতেছে। তাহারই ভিতরে হইতে এক-একজন আবার আর্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িতেছে।

ফিরিঙ্গি সর্দার ব্যাপারটির রহস্য উদ্ধার করিবার আগেই এই বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। যুদ্ধক্ষেত্রে রণহস্তী ভয় পাইলে যেমন দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া পালাইবার চেষ্টা করে, দস্যুদলের মধ্যেও সেই রকম ভাব দেখা দিল, সর্দারের হুকুমের অপেক্ষা না করিয়াই সকলে মরি-বাঁচি হইয়া ছুটিল নদীর দিকে—যেখানে ছিপ লইয়া তাদেরই কয়েকজন সঙ্গী অপেক্ষা করিতেছিল।

পরাজয় নিশ্চিত বুঝিয়া ফিরিঙ্গি-সর্দারও আর সময় নষ্ট করিল না ; জামার ভিতর হইতে শিঙা বাহির করিয়া আম-বাগান কাঁপাইয়া সুতীক্ষ্ণ সাঙ্কেতিক শব্দে ফিরিবার নির্দেশ দিল। যে সব দস্যু মন্দির-প্রাঙ্গণে লড়িতেছিল তারাও সেই শব্দে ভয়ত্রস্ত হইয়া লড়াই ছাড়িয়া ঊর্ধ্ব শ্বাসে নদীর দিকে ছুটিল।

অকস্মাৎ এই বিপর্যয়ের কারণ এইবার জানা গেল। আম-বাগানের পিছনে, ঈশান কোণের অন্ধকার চিরিয়া অন্তরীক্ষ হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর আসিয়া দস্যুদলের মধ্যে পড়িতেছে। কিন্তু কোথা হইতে যে আসিতেছে আর কে-ই বা ছুঁড়িতেছে তা কেহই বুঝিতে পরিল না।

৬ নন্দ চৌধুরী

বারোদীঘির অনতিদূরে চন্দনা গ্রাম। চন্দনার জমিদারদের সঙ্গে বারোদীঘির জমিদারদের বিশেষ সদ্ভাব নাই, এক সময়ে লাঠালাঠি প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। বর্তমান জমিদারদের আমলে সে ভাবটা কমিলেও বন্ধুত্বের কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। চন্দনার তরুণ জমিদার নন্দ চৌধুরী সম্বন্ধে বারোদীঘির মৃগাঙ্ক রায়ের মনোভাব যে বিশেষ অনুকূল নয় সে কথা আগেই বলিয়াছি।

চন্দনার জমিদারের খাসকামরায় সেদিন মজলিস বসিয়াছে। ঘরজোড়া পুরু গালিচা পাতা, একপাশে দুধের মত শাদা রেশমি চাদরের ফরাস। গোলাপ জল আর আতরের গন্ধে সারা ঘরখানি ভুর-ভুর করিতেছে। ফরাসের উপর মখমলের তাকিয়ায় হেলান দিয়া তরুণ জমিদার নন্দ চৌধুরী আরামে শুইয়া আছে। তার গায়ে মসলিনের ফিনফিনে মেরজাই, বাঁ হাতে কারুকার্যখচিত হাতির দাঁতের একটি নস্যাধার, সুগন্ধি নস্যে পূর্ণ।

.ফরাসের অন্য দিকে একদল বন্ধুবান্ধব নিজেদের মধ্যে নানা রকম রহস্যালাপ করিতেছে। ইহাদেরও সকলেরই বেশভূষায় যথেষ্ট পারিপাট্য রহিয়াছে।

ভৃত্য আসিয়া শ্বেতপাথরের গেলাসে করিয়া সকলের হাতে এক-এক গেলাস শরবৎ দিয়া গেল। গেলাসে দীর্ঘ একটি চুমুক দিয়া নন্দ চৌধুরী কহিল, 'তাহলে বারোদীঘির রায়েরা কাল বড় বাঁচা বেঁচে গেছে বল ?'

বন্ধুদের মধ্যে একজন, তার নাম রাসবিহারী, কহিল, 'তা আর বলতে! মৃগাঙ্ক রায় তো হাল ছেড়েই দিয়েছিল। ওদের সেই একগুঁয়ে সর্দারটা, কি নাম যেন,—হ্যাঁ, ভীমরাজ, সে বেটা তো গোড়ায় খুব তম্বি করে তাল ঠুকে এগিয়ে গেল। কিন্তু এ কি বাবা তোমার-আমার মত সহজ পাত্তর! খোদ ফিরিঙ্গির বাচ্চা এরা! মেরে তো প্রায় তুলো-ধুনো করেই এনেছিল!'

পিছনে হইতে আর একজন বলিল, 'তাও তো বন্দুক ছুঁড়বার সুবিধে পায় নি। তা পেলে—'

শেখরেশ্বর কহিল, 'কিন্তু যাই বল, শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা যেন হেঁয়ালি হয়ে রইল। কেউ কোথাও নেই, হঠাৎ আকাশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর এসে পড়তে লাগল! এ কী অদ্ভুত কাণ্ড রে বাবা!'

রাসবিহারী মুখের কথা আবার কাড়িয়া লইয়া বলিল, 'ওরা

তো বলছে স্বয়ং রাধামাধব এসে নাকি ভক্তকে উদ্ধার করেছেন আমার তো বিশ্বাস হয় না। দেবতা বটে, কিন্তু বোষ্টমের দেবতা, মা কালী নন তো আর!'

শিবনাথ একটু ধর্মভীরু, সে জিভ কাটিয়া কহিল, 'কী যে বলছ রাসবিহারী! মানুষের সম্বন্ধে যা খুশি বল, তাই বলে ঠাকুর-দেবতা নিয়ে কথা বলা ঠিক নয়। ওঁরা ইচ্ছে করলে কী না করতে পারেন? চৌধুরী মশাইকেই জিজ্ঞাসা কর না।'

নন্দ চৌধুরী কোন জবাব দিল না, শুধু মৃদু হাসিয়া নীরবে একটিপ নস্য লইয়া নাকের ভিতর গুঁজিয়া দিল।

ভৃত্য আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাকরণবাগীশ মশাই বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন, তাঁকে ভিতরে ডাকা হইবে কি? ব্যাকরণ-বাগীশের নাম শুনিয়া সকলেই কৌতূহলান্বিত হইয়া উঠিল। নন্দ চৌধুরী পুনরায় মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে তাঁহাকে আনিবার নির্দেশ দিল।

হরিদাস ব্যাকরণবাগীশ নামের সঙ্গে সর্বদা ব্যাকরণ লইয়া ঘুরিলেও আসলে ব্যাকরণের বড়-একটা ধার ধারেন না—তাঁর প্রধান ব্যবসায় ঘটকালি। লোকটি দেখিতে ভাল মানুষ, কিন্তু কথাবার্তায় বেশ তুখড়, এবং বড়লোকের মন জোগাইবার জন্য যে সব সদ্‌গুণের প্রয়োজন তাহাও তাঁর আছে। ফলে এ অঞ্চলের সর্বত্রই তাঁর গতিবিধি,—প্রায় সকলেই তাঁকে চেনে। ঘরে ঢুকিয়া সসঙ্কোচে তিনি ফরাসেরই এক কোণায় আসন গ্রহণ কবিলেন।

নন্দ চৌধুরী কেমন আছেন, তাঁর মা কেমন আছেন, তাঁর বাড়ির প্রধান কর্মচারী হইতে শুরু করিয়া প্রত্যেকটি দাসদাসীকে কেমন আছে ইত্যাদি ভদ্রতাসূচক সংবাদগুলি সংগ্রহ করিতে কিছু সময় গেল, এবং প্রত্যুত্তরে নিজের ও নিজের আত্মীয়স্বজনের কুশল-সংবাদ জানাইয়া ব্যাকরণবাগীশ আসল কথা পাড়িলেন। অর্থাৎ মৃগাঙ্ক রায়ের কাছে তিনি গিয়াছিলেন, বিবাহের প্রস্তাবও

তুলিয়াছিলেন কিন্তু মৃগাঙ্ক রায়ের ভাবগতিক তাঁর ভাল লাগে নাই। আর তাঁর সেই মেয়েটি—বাপের সেই আদুরে মেয়েটি,—সেই প্রগল্‌ভা, অকালপক্ক, বাচাল জমিদার-কন্যা নাকি নিজে মুখেই এমন সব কথা বলিয়াছে যা উচ্চারণ করিতেও তাঁর সঙ্কোচ হইতেছে। অথচ না বলিলেই বা চলে কেমন করিয়া ?

শুনিয়া বন্ধুর দল ক্ষেপিয়া উঠিল। রাসবিহারী সজোরে ফরাসে চাপড় দিয়া কহিল, 'এ অপমান অসহ্য! কী বলেছে ভাল করে বল।'

অনেক কিছুই বলিয়াছে। অপদার্থ, অকর্মণ্য, অলস ইত্যাদি কিছুই নাকি আড়াল হইতে বলিতে সে বাকি রাখে নাই। এমন কি অমন লোকের গলায় মালা দেওয়ার চাইতে একগাছি দড়ি লইয়া গলায় দিতেও নাকি তার বেশি আপত্তি হইবে না—এইরকম সব কথাও নাকি আভাসে জানাইয়া দিয়াছে। হ্যাঁ, একখানি মেয়ে বটে!

'বেশ, বেশ, দেখা যাবে। চন্দনার লোকেরাও ঘুমোয় না। সব দেখতে পায় এবং দরকার হলে দেখাতে পারে।'—রাসবিহারী আবার গর্জন করিয়া উঠিল।

কিন্তু নন্দ চৌধুরীর মেন তেমন ভাবান্তর দেখা গেল না। সে কাং হইয়া আর-এক টিপ নস্য লইয়া নাকে পুরিয়া দিল, তারপর কহিল, 'যেতে দাও, যেতে দাও। ছেলেমানুষ, কী না কী বলেছে, তার ওপর অত হৈ-চৈ লাগিয়েছ কেন? বল হে, রায় মশায়ের খবরটা বল। তারপর, ওখানে কী দেখে এলে? ফিরিঙ্গিরা নাকি বাড়ি চড়াও হয়েছিল?'

রাসবিহারী বিরক্ত কণ্ঠে কহিল, 'চৌধুরী মশায়ের ঐ এক রকম! সব কথাই তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দেন। এভাবে অপমান করে পার পেয়ে যাবে—এ আপনি সহ্য করবেন!'

নন্দ চৌধুরী তেমনি মৃদু হাসিয়া কহিল, 'অপমান গায়ে মাখলেই

অপমান, ঝেড়ে ফেললেই চুকে গেল, ব্যস্‌। এমন সন্ধ্যাটা কোথায় একটু খোসগল্প করে কাটাব, তা না তুললে এক ঝগড়ার ফিকির! তুমিও যেমন! বল হে ব্যাকরণবাগীশ, কালকের ব্যাপারটা খুলে বল। নস্যি নেবে?'—বলিয়া সে নিজে আর এক টিপ নস্য নাকে গুঁজিয়া কৌটাটি ব্যাকরণবাগীশের দিকে ছুঁড়িয়া দিল। কোন রকম হাঙ্গামার মধ্যে যাইবার লোক নন্দ চৌধুরী নয়; তা যতই মান-অপমানের প্রশ্ন উঠুক না কেন। সাধে কি লোকে তার নাম দিয়াছে—অপদার্থ জমিদার?

কিন্তু রাসবিহারীর দল ছাড়িবার পাত্র নয়। বহুদিন পরে তারা এক দিলখোলা মনের মত জমিদার পাইয়াছে, উঠিতে বসিতে যে তাদেরই উপর নির্ভর করিয়া থাকে। কাজেই তার ভালমন্দ এবং সেই সঙ্গে গাঁয়েরও ভালমন্দ তারা না দেখিলে কে দেখিবে? মৃগাঙ্ক রায়কে একটু সমঝাইয়া দেওয়া দরকার। কন্দর্প চৌধুরী বাঁচিয়া নাই বলিয়া সে যেন বড় বাড় বাড়িয়াছে। কন্দর্প নাই, কিন্তু তারা আছে। নন্দ চৌধুরী তাদেরই মুঠোর মধ্যে। হুঁ!

সেদিন খোসগল্প তেমন জমিল না। ব্যাপার দেখিয়া ব্যাকরণবাগীশও ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িলেন। বন্ধুবর্গ একে একে বিদায় লইল। ভৃত্য আলো জ্বালাইয়া দিয়া গেলে নন্দ তাকিয়ার তলা হইতে একটা মোটা-সোটা পুঁথি বাহির করিল। তারপর নাকে আর-এক টিপ নস্য গুঁজিয়া তার মধ্যে তন্ময় হইয়া ডুবিয়া গেল। এই নীরস পুঁথির মধ্যে কী যে রস আছে তা শুধু সেই জানে!

৭ ফিরিঙ্গির চক

শরৎ কাল। কিন্তু বর্ষার ছাপ তখনও প্রকৃতির বুক হইতে নিঃশেষ হয় নাই। গঙ্গার জল তখনও বেশ ঘোলাটে, তেমনই পাক খাইয়া খাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

সুন্দরবনে তখন ভাটিয়ার চর বিখ্যাত জায়গা,—বড় বন্দর। নানা জায়গা হইতে ব্যবসায়ীরা আসিয়া জড় হয়; বছরের কয়েকটা মাস লোকজনে গম্ গম্ করে। বড় বড় জাহাজ ও পণ্যবাহী নৌকায় স্থানটি আকীর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু আপাতত আমরা ভাটিয়ার চর ছাড়িয়া ফিরিঙ্গির চকের কথাই বলিব। ভাটিয়ার চর হইতে আরও কয়েক ক্রোশ দক্ষিণে এই ফিরিঙ্গির চক। নামে চক হইলেও সাধারণত চক বলিতে যে বস্তু বুঝায় এটি ঠিক সেই পর্যায়ে পড়ে না। গঙ্গা এখানে আরও চওড়া হইয়া আসিয়াছে; দৃষ্টিশক্তি খুব তীক্ষ্ণ না হইলে সহসা এপার হইতে ওপার ঠাহর করিতে পারা যায় না। তার উপর এইখানটায় নদীর একটা বড় বাঁক থাকায় জায়গাটার মর্যাদাও যেন একটু বাড়িয়াছে।

নদীর বাঁকের ঠিক উপরেই একটি বিরাট দুর্গ। দুর্গের চেহারায় একটু বৈশিষ্ট্য আছে। মুসলমান আমলে এ দেশে যে ধরনের কেল্লা দেখা যাইত এটি সেরূপ নহে, বরঞ্চ ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীতে ইয়োরোপের নানা অঞ্চলে—বিশেষত স্পেন বা পর্তুগালে যে ধরনের দুর্গ দেখা যাইত তাহারই সঙ্গে ইহার সাদৃশ্যটা যেন বেশি। দুর্গের প্রাচীর জলের উপর হইতে খাড়া উঠিয়া গিয়াছে। অতি শক্ত তার গাঁথুনি, ভাগীরথীর ঢেউ দিবারাত্র আছড়াইয়া পড়িয়াও তাকে বিন্দুমাত্র আলগা করিতে পারে নাই। খাড়া দেয়াল, নিচে দাঁড়াইয়া উপরের দিকে চাহিলে বুক দুরু দুরু করে। দেয়ালের গা আগাগোড়া মসৃণ, শুধু অনেক উঁচুতে পায়রার খোপের মত ছোট ছোট কয়েকটা ঘুলঘুলি ছাড়া বড় কিছু একটা নজরে পড়ে না।

দুর্গের অপর দুই দিক—অর্থাৎ যে দিকটা নদী ঘিরিয়া রাখে নাই,—সে দিকে রহিয়াছে বিস্তৃত পরিখা। এই পরিখার সঙ্গে নদীর যোগ আছে; ইচ্ছা করিলে জল ঠেকাইয়া রাখা যায়, আবার প্রয়োজন হইলে মুহূর্তের মধ্যে গঙ্গার জলে সমস্ত পরিখা ভাসাইয়াও ফেলা যায়। দুর্গের প্রধান ফটকের সামনে আলগা সেতু। ইচ্ছা

করিলে কপিকলের সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে এই সেতুও তুলিয়া ফেলা কিছু কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়।

দুর্গের আশেপাশে অন্য কোন লোকালয় নাই বলিলেই চলে। বড় বড় সুন্দরী, শাল আর দেবদারু গাছে জায়গাটি ঘেরা। ডাঙার দিক হইতে অগ্রসর হইলে সেই ঘন অরণ্যের ফাঁক দিয়া দুর্গটি সহসা নজরে পড়ে না।

নদীর দিক হইতে দেখিলেও দুর্গটিকে রহস্যময় বলিয়াই বোধ হইবে। বাস্তবিক দুর্গের ভিতরটিও কম রহস্যময় নয়। যেমন বিরাট তার আকৃতি তেমনি আশ্চর্য তার ভিতরকার গঠন-প্রণালী। বাহির হইতে তার কোনরূপ হদিস পাওয়া একেবারেই দুঃসাধ্য।

বলা বাহুল্য দুর্গটি ফিরিঙ্গিদের; এবং ইহারই জন্য জায়গাটির নামও 'ফিরিঙ্গির চক'। কেউ কেউ 'ফিরিঙ্গির গড়'ও বলিয়া থাকেন।

আগেই বলিয়াছি এই সময়ে পর্তুগিজরা ধীরে ধীরে ভারতের নানা অঞ্চলে—বিশেষ করিয়া উপকূল ভাগে ও জলপথে আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছিল। জলপথে তাদের প্রতাপে দেশীয় রাজা-প্রজা সকালেই তটস্থ হইয়া উঠিয়াছিল। পর্তুগিজদের উন্নত প্রণালীর নৌবাহিনীর সঙ্গে পাল্লা দিবার ক্ষমতা তাদের ছিল না। পর্তুগিজরা দক্ষিণ ভারত হইতে বাংলা দেশেও হাজির হইতে কসুর করে নাই, এবং ধীরে ধীরে নানা জায়গায়—বিশেষত নিম্ন বঙ্গে নিজেদের ঘাঁটি বসাইতেছিল। ফিরিঙ্গির চক তারই একটি।

বেলা তখন তিন প্রহর পার হইতে চলিয়াছে। পড়ন্ত সূর্যের রাঙা আলোর খানিকটা গঙ্গার ঢেউ ডিঙাইয়া দুর্গের পশ্চিম কোণের একটি কক্ষে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছিল। ঘরটি প্রশস্ত। একধারে খানিকটা জায়গা পুরু কাঠের সাহায্যে বেদীর মত উঁচু করা। তার উপরে ইতস্তত কতকগুলি কাচের ও পাথরের অদ্ভুত দ্রব্য এবং হামানদিস্তা প্রভৃতি ওষুধ প্রস্তুতের উপকরণ ছড়ান রহিয়াছে। আর একপাশে কতকগুলি শাদা, লাল প্রভৃতি রং-

বেরংএর গুঁড়া, কালো কালো আঠাল সামগ্রী এবং রঙিন তরল পদার্থ পাত্রমধ্যে পড়িয়া আছে। আর আছে খানকয়েক মোটাসোটা পুঁথি,—তার অক্ষরগুলিও ঘরের অন্যান্য দ্রব্যের মতই কিম্ভূত-কিমাকার।

ঘরের অপর পাশে একটি কাষ্ঠ ও চর্মনির্মিত কেদারা। তার উপর বসিয়া একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক গভীরভাবে কি চিন্তা করিতেছেন। প্রৌঢ়ের পোশাকপরিচ্ছদ, বক্ষবিলম্বিত দীর্ঘ শ্মশ্রু এবং পেশীবহুল শরীরের মধ্যে এমন একটা কিছু লক্ষ্য করা যায় যাহাতে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে ইনি এই দুর্গের একজন ক্ষমতাশালী বাসিন্দা। বাস্তবিকই তাই। প্রৌঢ়ের নাম ফ্রান্‌সিস্কো বারেটো। ইনি এই দুর্গের ধর্মযাজক এবং চিকিৎসক।

আরও খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল। বারেটোর চিন্তা-ব্যাকুল মুখে কেমন যেন একটু বিচলিত ভাব ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। হঠাৎ দরজায় কার ছায়া পড়িল। বারেটো যেন ইহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, মাথা তুলিয়া বলিলেন, 'ভিতরে এস।'

দুটি পর্তুগিজ সৈনিকের সঙ্গে যে লোকটি ঘরে ঢুকিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল তাকে আমরা আগে আর একবার দেখিয়াছি। বারোদীঘির নৈশ অভিযানে এই লোকটিই পথপ্রদর্শকের অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। লোকটি আর কেউ নয়,—দুরন্ত মগ বিব্বু।

৮ জয়ন্ত বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে

বিব্বু নত হইয়া অভিবাদন করিল। বারেটো সৈনিকদুটিকে চলিয়া যাইবার ইঙ্গিত করিলেন। ঘরে রহিল বিব্বু একা। কিছুক্ষণ কেহই কোন কথা কহিল না, একটা থমথমে নীরবতা সমস্ত ঘরখানিকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিল।

সহসা সেই নিস্তব্ধতা চিরিয়া বারেটোর উত্তেজিত কণ্ঠ ধ্বনিত হইল—'তোমরা একেবারেই অপদার্থ!'

বিব্বুর ভাঁটার মত চোখদুটি নিমেষের জন্য জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সে-ভাব চাপিয়া শান্তকণ্ঠে সে শুধু কহিল, 'দোষ আমার একার নয়, আপনার পর্তুগিজ সৈন্যেরা সামান্য কারণে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাবে তা কে জানত? তা ছাড়া ডি-মেলো যদি নিজেই তাঁর অনুচরদের সামলাতে না পারেন তো অপরের পক্ষে—'

বাধা দিয়া বারেটো কহিলেন, 'কারণ ঠিক সামান্য বলা যায় না। শুনলাম আকাশ থেকে নাকি তীর এসে পড়তে শুরু করে। এসব আঁটঘাট যদি আগে থাকতে বেঁধে না নেওয়া হয় তবে আর এত খরচ করে গুপ্তচর পুষবার কী দরকার? আকাশ থেকে দেবতা যুদ্ধ করেছেন—এসব আজগুবি গল্প হিন্দুরা বিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু আমরা, সভ্য খৃষ্টানরা, তা বিশ্বাস করি না। এর ভেতরের রহস্যও জানা দরকার।'

বিব্বু এবার আর কোন জবাব দিল না।

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। এবারেও নীরবতা ভাঙিলেন বারেটো। কহিলেন, 'শোন, যে জন্য তোমাকে ডাকিয়ে এনেছি। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু আমার কাজও চাই, একটা বাধাতেই এলিয়ে পড়ব—সে জাত আমরা নই। অত সহজে দমবার জন্য আমরা সাত-সমুদ্দুর পার হয়ে এই বিদেশে আসি নি। এ সোনার দেশ। কতকগুলো মূর্খ পুতুল-পূজারীর হাতে এ দেশ ফেলে রাখা নিশ্চয়ই ভগবানের অভিপ্রেত নয়। তিনিই আমাদের পাঠিয়েছেন। আমরা এ দেশ দখল করব, ভোগ করব; সেইসঙ্গে এখানকার বর্বরগুলোকেও মানুষ করব। পবিত্র প্রেমধর্মে তাদের দীক্ষা দেব।'

বারেটোর স্বর উত্তেজিত হইয়া উঠিল, তিনি বলিয়া চলিলেন, 'এখানকার সংস্কৃতে নাকি বলে, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। কথাটা আমরাও মানি। আমরা বীর, বসুন্ধরা আমাদেরই ভোগ্যা। কিন্তু আমাদের দেশের শাস্ত্রে এও বলে যে শুধু বীরত্বে যদি কখনো না

কুলোয় তবে কৌশলের সাহায্য নিতেও বাধা নেই। এবং এখন তাই হয়ত আমাদের নিতে হবে।'

বারেটো এবার বিব্বুর খুব কাছে আগাইয়া আসিলেন। মৃদুস্বরে কহিলেন, 'তোমাদের ঐ বৈষ্ণব জমিদার—কী নাম যেন, হ্যাঁ, মৃগাঙ্ক রায়,—তার একটি ছেলে আছে না?'

'হ্যাঁ। জয়ন্ত।'

'জয়ন্ত? বেশ। কত বয়স? দশ-বারো—না আরো বেশি?'

'না, ঐ রকমই হবে।'

'ভাল।'

'আর একটি মেয়েও আছে, জয়ন্তের চেয়ে কিছু বড়!'

'মেয়ে! বেশ বেশ, সে তো আরও ভাল। কিন্তু—নাঃ, হিন্দু মেয়েরা তো অন্দরেই পড়ে থাকে। বাইরে বেরোতে চায় না। তার চেয়ে ঐ, কী নাম বললে, জয়ন্ত? হ্যাঁ, জয়ন্তই ভাল।'

বারেটোর লোমশ ভ্রূযুগল কয়েক বার কুঞ্চিত হইল। এবারে তিনি আরও নিকটে, প্রায় বিব্বুর কানের কাছে মুখ লইয়া আসিয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া কি বলিয়া গেলেন। বিব্বু বারকয়েক ঘাড় নাড়িল। তারপর আবার সব চুপ।

বারেটো কাঠের উঁচু বেদীর দিকে আগাইয়া গেলেন। এক কোণা হইতে দুটি গেলাস তুলিয়া লইয়া সম্মুখের একটি পাষাণপাত্র হইতে খানিকটা ফেনিল তরল পদার্থ ঢালিয়া গেলাস দুইটি পূর্ণ করিতে করিতে বলিলেন, 'বেশি দেরি আমার সইবে না। নিমপুকুর থেকে চাঁদপাল বারে বারে লোক পাঠাচ্ছে। সে অধৈর্য হয়ে পড়েছে, আমিও তার কাছে অপ্রস্তুত হয়ে আছি। খুব শিগ্‌গিরই ব্যবস্থা করা চাই।'

গেলাস পূর্ণ হইল। বারেটো একটি লইয়া বিব্বুর দিকে আগাইয়া দিলেন, বিব্বু পৈশাচিক আগ্রহে সেটি সাপটাইয়া ধরিল। মৃদু হাসিয়া বারেটো অপর গেলাসটি তুলিয়া উঁচু করিয়া ধরিলেন, তারপর ঠন্ করিয়া বিব্বুর গেলাসে একবার ঠেকাইয়া কহিলেন,

'আমাদের বিশ্বাসের নামে।' পরক্ষণেই ফেনিল রস তাঁহার শ্মশ্রু বাহিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বিব্বু তাহার আগেই উহা নিঃশেষ করিয়াছিল।

ভোরের আলো টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া আসিয়া সুশ্বেতার মুখে-চোখে ঝরিয়া পড়িতেছিল। সুশ্বেতার ঘুম ভাঙিয়া গেল। ওঃ, বড় বেলা হইয়া গিয়াছে! এত বেলায় সে কখনও ওঠে না। প্রায় অন্ধকার থাকিতেই রাধামাধবের মন্দিরে স্তবগান হয়, মৃগাঙ্ক রায়ের আদেশে বাড়ির সকলকেই সেখানে হাজির থাকিতে হয়, এমনকি জয়ন্তকে পর্যন্ত। জয়ন্ত অবশ্য মাঝে মাঝে দেরি করে—বিশেষত শীতের ভোরে তাকে টানিয়া তোলা বেশ কঠিন ব্যাপার। কিন্তু সুশ্বেতার কখনও দেরি হয় না। সে-ই বরঞ্চ জয়ন্তকে টানিয়া লইয়া যায়। ভাইবোনে যুক্তকণ্ঠে হাঁটু গাড়িয়া আবৃত্তি করিতে থাকে—

'প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্।
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্
কেশব-ধৃত মীনশরীর,—জয় জগদীশ হরে।
ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে
ধরণীধারণকিণচক্রগরিষ্ঠে
কেশব-ধৃত কূর্মশরীর,—জয় জগদীশ হরে!'

এত চমৎকার লাগে তার এই স্তোত্রটি!

কিন্তু আজ এ কী ব্যাপার! ভোরের দিকে সে স্বপ্ন দেখিয়াছিল। বড় বিশ্রী স্বপ্ন। ঘুমের মধ্যেই হয়ত মনটা খারাপ হইয়া ছিল, তাই কি এমন হইল?

কয়েকদিন আগের সেই ভীষণ রাতের কথা তার মনে পড়িল। মন্দিরের সেই উৎসবের দিন, যেদিন রাত্রে ডাকাতেরা হঠাৎ তাদের বাড়ি আর মন্দির আক্রমণ করে। ম্লেচ্ছ ডাকাত নিশ্চয়ই, নহিলে কি রাধামাধবের মন্দির অপবিত্র করিতে সাহস করে? ডাকাতরা

অবশ্য শেষ পর্যন্ত কিছুই করিতে পারে নাই। রহস্যজনক অবস্থায় ছুটিয়া পলাইয়াছে। মৃগাঙ্ক রায় বলেন, স্বয়ং রাধামাধব অন্তরীক্ষ হইতে তাঁদের রক্ষা করিয়াছেন। নিশ্চয়ই তাই, কিন্তু তবু ভাবিতে কেমন যেন লাগে! রাধামাধব প্রেমের দেবতা, ভালবাসা দিয়াই তিনি জয় করিতে শিখাইবেন; তিনিও কি অস্ত্র লইয়া আগাইয়া আসিয়াছিলেন? কী জানি!

আর জয়ন্তকে লইয়া সেদিন যা বিভ্রাট গিয়াছে! ডাকাতেরা মন্দির আক্রমণ করিল, সেইসঙ্গে জমিদার-বাড়িও। সবাই তাদের ঠেকাইতে ব্যস্ত, এমন সময় কিনা জয়ন্ত গেল হারাইয়া! এমন অবস্থা তখন, যে তার খোঁজ করিবারও উপায় নাই। ডাকাতরা চলিয়া গেলেও বহুক্ষণ পর্যন্ত তার খোঁজ মেলে নাই, ভাবনায় চিন্তায় বাড়িশুদ্ধ লোক অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। শেষে শেষরাত্রে দেখা গেল, ছাদে উঠিবার সিঁড়ির ঠিক নিচে সে দিব্যি একখানি উড়ানি গায়ে জড়াইয়া ঘুমাইতেছে। সমস্ত বাড়ি পাঁতি-পাঁতি করিয়া খোঁজ হইয়াছিল, আর এ জায়গাটাই কি আর দেখা হয় নাই? এও যেন রাধামাধবেরই এক বিচিত্র লীলা!

কিন্তু আর শুইয়া থাকা চলে না, সুশ্বেতা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। জয়ন্তের বিছানাও খালি। সেও তবে আজ তার আগে উঠিয়া গিয়াছে! নাঃ, সুশ্বেতা আজ লোক হাসাইল।

মন্দিরের দিক হইতে তখন ঠাণ্ডা হাওয়ায় অস্পষ্ট গানের কলি ভাসিয়া আসিতেছিল—শ্রীরামের স্তবগান:

'শুদ্ধ ব্রহ্মপরাৎপর রাম,
কালাত্মক পরমেশ্বর রাম,
শেষতল্পসুখনিদ্রিত রাম,
চন্দ্রকিরণকুলমণ্ডক রাম,
শ্রীমদ্দশরথনন্দন রাম,
অগণিত গুণিগণভূষিত রাম,

অবনীতনয়াকামিত রাম
রঘুপতি রাঘব রাজা রাম,
পতিতপাবন সীতারাম,
রাম রাম জয় রাজা রাম।'

সুশ্বেতা ত্বরিতপদে সেইদিকে অগ্রসর হইল।

বাড়ির সকলেই প্রায় আসিয়াছে। মৃগাঙ্ক রায় চোখ বুঁজিয়া করজোড়ে বসিয়া আছেন এবং থাকিয়া থাকিয়া গুণ্‌গুণ্‌ করিয়া স্তবের সহিত নিজের কণ্ঠ মিলাইতেছেন। সুশ্বেতার পদশব্দে তিনি একবার চকিতে চোখ খুলিয়া দেখিলেন—এবং চোখেরই ইসারায় বসিবার ইঙ্গিত করিয়া আবার ধ্যানস্থ হইলেন। সুশ্বেতা এদিক্‌-ওদিক্‌ তাকাইয়া নিজের জায়গাটিতে গিয়া বসিল।

কিন্তু মন যেন তবু বসিতে চায় না। সুশ্বেতা চাহিয়া দেখিল, জয়ন্ত তার জায়গাটিতে নাই। চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল, কোথাও তাহাকে দেখা যাইতেছে না। আজও বোধহয় সে পালাইয়াছে।

স্তবগান শেষ হইল। মন্দিরে প্রণাম করিয়া যে যার আপন কাজে চলিয়া গেল; মৃগাঙ্ক রায় ধীরে ধীরে সুশ্বেতার দিকে আগাইয়া আসিলেন। মুখের ভাব দেখিয়া তাঁর মনের ভাব বুঝিতে সুশ্বেতার বাকি রহিল না। তবু সে মুখে কহিল, 'জয়ন্তকে দেখছি না তো।'

মৃগাঙ্ক রায়ের মুখমণ্ডল কঠিন হইল, গম্ভীরভাবে তিনি কহিলেন, 'হুঁ, বড় বেড়েছে! আর প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। আসুক আজ বাড়ি।' সুশ্বেতা হইলে যেটুকু জয়ন্তের ছেলেমানুষী বলিয়া উড়াইয়া দিত মৃগাঙ্ক রায় যেন তাহারই মধ্যে একটা অমঙ্গলের কালো ছায়া দেখিতে পাইতেছিলেন।

কিন্তু বেলা প্রথম প্রহর পার হইয়া গেল, জয়ন্তের দেখা নাই। না বলিয়া কোথাও গিয়া এত বেলা পর্যন্ত থাকিবার সাহস তার ইতিপূর্বে হয় নাই। মৃগাঙ্ক রায়ের মুখের অবস্থা দেখিয়া সুশ্বেতা ক্রমেই চঞ্চল হইয়া পড়িল।

বেলা আরো বাড়িল, তবু জয়ন্তের দেখা নাই। শেষে বেলা প্রায় গড়াইয়া আসিল। জয়ন্ত তখনও ফিরিল না।

জয়ন্ত কোথায় গেল ? ৯

পরদিন। বিকালের পড়ন্ত সূর্য দীঘির ধারে নারিকেল গাছের আড়ালে অনেকখানি হেলিয়া পড়িয়াছে। জমিদার-বাড়ির সম্মুখের আঙিনায়ও ছায়া ক্রমেই দীর্ঘতর হইয়া আসিতেছে। ঘরের সম্মুখে একখানি কেদারার উপর মৃগাঙ্ক রায় বিষণ্ণ মুখে বসিয়া বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিলেন। গতকাল জয়ন্ত তো ফেরেই নাই, আজ এখন পর্যন্ত তার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাঁহার কাছে আর-একখানি কেদারায় রসরাজ বসিয়া—তাঁরও মুখের সেই প্রফুল্ল ভাব আর নাই। অদূরে সিঁড়ির পাশে গোমস্তা হরিচরণ মাথা নিচু করিয়া বসিয়া আছে। দরজার আড়ালে সুশ্বেতা ছল-ছল চোখে দাঁড়াইয়া আছে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তার চোখের পাতাদুটি ফুলিয়া উঠিয়াছে।

জয়ন্তের অন্তর্ধানটাকে সুশ্বেতা প্রথমটা ছেলেমানুষ-সুলভ কুবুদ্ধি বলিয়াই ভাবিয়াছিল। কিন্তু কাল গভীর রাত পর্যন্ত যখন তার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না, জমিদার-বাড়ির বরকন্দাজরা আলো লইয়া আশপাশের সর্বত্র পাঁতি-পাঁতি করিয়া খুঁজিয়াও যখন শুষ্কমুখে ফিরিয়া আসিল তখন এক অজানা অমঙ্গলের কথা ভাবিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। সারা রাত সে ঘুমায় নাই—বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুধু কাঁদিয়াছে, সামান্য একটু আওয়াজ শুনিলেই ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়াছে। পাশের ঘরে তার বাবার চোখেও যে ঘুম ছিল না, তাও তার বুঝিতে কষ্ট হয় নাই। তারপর আজ সকালবেলা মন্দিরে পূজার সময়েও সে সর্বক্ষণই অন্যমনস্ক হইয়া ছিল। ঠাকুর এ কী দুর্ভাবনার মধ্যে তাহাদের ফেলিলেন! নানারকম সম্ভব-অসম্ভব কল্পনায় সুশ্বেতা যেন পাগল হইয়া উঠিতেছিল!

অনেকক্ষণ কাহারও মুখে কথা ছিল না। সহসা রসরাজ স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন, 'আচ্ছা, এর মধ্যে নন্দ চৌধুরীর কোন চাল নেই তো? সুশির সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করে সে এতবার লোক পাঠিয়েছে, কিন্তু এদিক থেকে কোন আমলই পায়নি। তাই কৌশল করবার জন্য—? তাছাড়া জয়ন্তকে তো শুনতে পাই এমনিই সে হাত করার জন্য নানা ফন্দিফিকির পাকাচ্ছিল।'

কথাটা মৃগাঙ্ক রায় যে ভাবেন নাই তা নয়। নন্দ চৌধুরী সুশ্বেতাকে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া একাধিকবার লোক পাঠাইয়াছে। এই সেদিনও হরিদাস ব্যাকরণবাগীশ আসিয়া নানা কথায় তাঁহার মন ভিজাইবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু অমন অপদার্থ যুবককে জামাই করিবার কথা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন না। সুশ্বেতারও যে উহাতে একেবারেই মত নাই তাহাও তাঁহার অজানা নহে। তা ছাড়া চন্দনার চৌধুরীদের সঙ্গে তাঁদের ধরিতে গেলে তিন পুরুষের বিবাদ। নন্দর বাবা কন্দর্প চৌধুরীর আমলে সে বিবাদ প্রায় শত্রুতা হইয়া দাঁড়ায়। তবু কন্দর্প চৌধুরী ছিলেন ডাকসাইটে জমিদার। আশেপাশের দশখানা গ্রামের লোকে তাঁকে দস্তুরমত সম্ভ্রম করিত। এমনকি খোদ সুবাদারের লোকেরাও তাঁকে ঘাটাইতে সাহস পাইত না। নন্দ চৌধুরী যদি বাপের মতও হইত তবে হয়ত পুরানো বিবাদ সত্ত্বেও তিনি কথাটা একটু ভাবিয়া দেখিতেন। কারণ বংশমর্যাদায় চৌধুরীরা তাঁদেরই পাল্টা ঘর। কিন্তু এই ছোকরা জমিদারের চালচলন সম্বন্ধে যে সব খবর তিনি শুনিয়াছেন, তারপর আর ও-বিষয়ে চিন্তা করাও তিনি প্রয়োজন বোধ করেন না। অথচ বেশ বুঝিতেছিলেন, যে কারণেই হোক জয়ন্ত ঐ অপদার্থ টার খর্পরে গিয়া পড়িতেছে। নন্দ চৌধুরীর নিজের ব্যক্তিত্ব বলিয়া কিছু নাই, পারিষদ বন্ধুরা যেভাবে চালায় সেইভাবেই সে চলে। হয়ত তাদেরই কারও প্ররোচনায় সে জয়ন্তকে কোনক্রমে আটকাইয়া রাখিয়াছে। কী তার অভিসন্ধি কে জানে!

কিন্তু রসরাজের কথায় প্রতিবাদ করিল হরিচরণ। কহিল, 'আজ্ঞে, নন্দ চৌধুরীর বিষয় ভাল করে জানলে এ কথা আপনার মনে আসত না। অত্যন্ত কুঁড়ে লোক সে, দিবারাত্র তাকিয়া হেলান দিয়ে পড়ে পড়ে নস্যি নিচ্ছে আর যতরাজ্যের গাঁজাখুরি জিন-পরীদের গল্প নিয়ে মেতে আছে। এতটা ফন্দিফিকির খাটাতে হলে তবু কিছু হাত-পা নাড়াতে হয়, মাথা ঘামাতে হয়। সে চরিত্রের লোকই নয় সে, একেবারে বেহদ্দ কুঁড়ে।'

কিন্তু তা হইলে জয়ন্ত গেল কোথায়? দুরন্ত হইলেও গ্রামের সকলে তাকে ভালবাসে। মৃগাঙ্ক রায়ও জমিদার হিসাবে সকলেরই প্রিয় পাত্র, তাঁর প্রতি তেমন আক্রোশ কাহারও আছে বলিয়া মনে পড়ে না। দিন-দুপুরে জলজ্যান্ত ছেলেটা তবে উধাও হইয়া গেল!

মৃগাঙ্ক রায় কোন উত্তর দিলেন না, তেমনি গম্ভীর—তেমনি বিষণ্ণ মুখে আলবোলায় ধূম উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ দূরে একটা সোরগোল শোনা গেল। যেন একসঙ্গে অনেকগুলি ছোট ছেলের সহর্ষ চীৎকার। মৃগাঙ্ক রায় হরিচরণকে কহিলেন, 'দেখ তো কী ব্যাপার?'

হরিচরণ উঠিয়া গেল এবং খানিকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া মৃদু বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া কহিল, 'ও কিছু না, পাড়ার ছেলেরা শেখর ঠাকুরের পেছনে লেগেছে।' মৃগাঙ্ক রায় দুঃখের মধ্যেও ক্ষীণ হাসিয়া কহিলেন, 'ছেলেগুলো বড্ড দুষ্টু হয়ে উঠেছে। বেচারিকে জ্বালিয়ে খেলে!'

ব্যাপারটার একটু ইতিহাস আছে। শেখর ঠাকুর অর্থাৎ শেখরেশ্বর গোস্বামী রাধামাধবের মন্দিরের পুরোহিত। ভদ্রলোকের বয়স হইয়াছে,—বোধহয় তিন কুড়ি পার হইতেও বেশি বিলম্ব নাই। জমিদারের অনুগ্রহে ও ঠাকুরের সেবায় তাঁর শরীরখানিও বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট—মেদের পরিমাণ একটু বেশি, বার্ধক্যের কুঞ্চনরেখা অল্পসল্প দেখা দিলেও উজ্জ্বলতা কমে নাই। শেখর ঠাকুরের তিন সংসার, কিন্তু তা

সত্ত্বেও তাঁর বিবাহস্পৃহা আজও তিলমাত্র কমে নাই—এবং সুযোগ পাইলেই তিনি পত্নী-অন্বেষণে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ান। কিন্তু সেদিকে একটু বাধাও আছে। প্রথমত শেখরেশ্বর জাতিতে সৎ-ব্রাহ্মণ হইলেও কুলীন নহেন এবং যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে কুলীনের পক্ষে যেমন চিতারোহণের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত পাত্রীর অভাব হইত না—অকুলীন ব্রাহ্মণের পক্ষে তেমনি সুপাত্রী সংগ্রহ করা ছিল রীতিমত কষ্টসাধ্য। লোকে কুলীনে কন্যাদানের গৌরবকে খুব বড় গৌরব বলিয়া মনে করিত—এবং অনেক সময় অকুলীন সুপাত্রকে ঠেলিয়া নিতান্ত অপাত্রে কন্যাদান করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিত।

শেখরেশ্বরের দ্বিতীয় বাধা ছিল তাঁহার পত্নীবর্গ। পর-পর তিনটি পত্নী থাকা সত্ত্বেও স্বামীর নতুন করিয়া পত্নী-অন্বেষণ তাঁহারা বিশেষ প্রীতির চোখে দেখিতেন না—এবং তিনটি পত্নীই কম-বেশি মুখরা হওয়ায় শেখর ঠাকুরকে যৎপরোনাস্তি নাজেহাল করিয়া ছাড়িতেন। তবু শেখরেশ্বর লুকাইয়া এ-গ্রামে সে-গ্রামে পাত্রী দেখিয়া বেড়াইতেন এবং গোপনে বিবাহ-সম্বন্ধ পাকা করিয়া আসিতেন। ব্রাহ্মণীরা শেষ পর্যন্ত বেগতিক দেখিয়া গ্রামের দুষ্ট ছেলেদের ধরিয়া নিয়মিত মণ্ডা, নাড়ু উৎকোচ দিতে শুরু করিলেন, ছেলেরাও প্রতিদানে শেখরেশ্বরের বিবাহ-ব্যবস্থাগুলি নানাভাবে পণ্ড করিয়া দিতে শুরু করিল। পথে-ঘাটে এই বালখিল্যদের পাল্লায় পড়িলে পুরোহিত ঠাকুরের অবস্থা বিপন্ন হইয়া উঠিত। আজও নাকি শেখরেশ্বর লুকাইয়া লুকাইয়া অনতিদূরের কোন্ গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিবার আয়োজন করিতে গিয়া ধরা পড়িয়া গিয়াছেন, সোরগোলটি তাহারই পরবর্তী ঘটনা।

ছেলেদের কোলাহল ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিল, মৃগাঙ্ক রায় দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এমন সময় একটি লোক কোথা হইতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া সুদীর্ঘ সেলাম করিয়া একখানি চিঠি সামনে আগাইয়া দিল। লোকটিকে আমরা আগেও

একবার দেখিয়াছি। তার নাম ভীমরাজ—লাঠিয়ালদের সর্দার। মৃগাঙ্ক রায় হাত বাড়াইয়া কাগজটি লইয়া কহিলেন, 'কী খবর ভীমরাজ, এ কার চিঠি ? কোথায় পেলে ?'

ভীমরাজ তখনও হাঁপাইতেছিল, একটু দম লইয়া বলিল, 'নদীর ধারে একটা নতুন ধরনের নিশান গাড়া রয়েছে দেখে কাছে গিয়ে দেখি, তার গায়ে এই চিঠিখানা গাঁথা। নিশানটিতে যে ছবি আঁকা ছিল, চিঠিতেও দেখুন সেই চিহ্ন। একটা মড়ার খুলি, আর তার নিচে আড়াআড়িভাবে দুটি খোলা তলোয়ার। ঠিক এদেশী তলোয়ার নয়—ফিরিঙ্গি হার্মাদ যে ধরনের তলোয়ার ব্যবহার করে তেমনি। চিঠিটা তাই হুজুরের কাছে নিয়ে এলাম।'

মৃগাঙ্ক রায় কম্পিত হস্তে পড়িলেন :

'বারোদীঘির মহিমান্বিত জমিদার মহাশয় সমীপেষু—

আপনার পুত্র জয়ন্ত জীবিত আছে। কিন্তু সে নিরাপদে থাকিবে কি না তাহা নির্ভর করিতেছে আপনার সুবুদ্ধির উপর। তাহাকে কোনরূপ নির্যাতন না করিয়া মুক্তি দিতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার জন্য আপনাকে যৎসামান্য দক্ষিণা দিতে হইবে। আপনার মন্দিরের রাধামাধব নামে পুতুলটির জন্য যে রত্নহারটি আপনি সম্প্রতি ক্রয় করিয়াছেন সেটি দিলেই আপনার পুত্রকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। আশা করি আপনার পুত্রের মুখ চাহিয়া আমাদের এই সামান্য দাবি মানিয়া লইবেন। আগামী অমাবস্যার ভিতর আপনার উত্তর পাইব আশা করি। ঐ সময়ের মধ্যে কোন একদিন আপনার গ্রামের সন্নিকটে একটি ছোট নৌকা আমাদের নিশান-সমেত ঘাটে বাঁধা দেখিবেন। আপনার উত্তর, বা রত্নহারটি উহার মধ্যে রাখিয়া দিলেই তাহা আমাদের হস্তগত হইবে। কিন্তু সাবধান, আক্রমণ বা অন্য কোনরূপ গোলযোগের চেষ্টা করিবেন না, তাহাতে নিজের বিপদ তো ডাকিয়া আনিবেনই, পুত্রকেও আর ফিরিয়া পাইবেন না।'

চিঠির নিচে কোন নাম নাই, তার বদলে রহিয়াছে সেই সাঙ্কেতিক

চিহ্ন—মড়ার মাথা ও তার নিচে আড়াআড়ি ভাবে দুটি খোলা তলোয়ার।

পরামর্শ

১০

ফিরিঙ্গি দস্যুর দুঃসাহস যেমন ভীষণ, দাবিও তেমনি অসম্ভব। না, না, না—এরূপ অসম্ভব সর্তে মৃগাঙ্ক রায় কিছুতেই রাজি হইতে পারেন না। যে পবিত্র হার মন্ত্রঃপূত করিয়া স্বয়ং দেবতাকে নিবেদন করিয়াছেন, নিজের স্বার্থের জন্য আবার তা ফিরাইয়া লওয়ার কথা তিনি ভাবিতে পারেন না। বিশেষ করিয়া তা কিনা আবার দিতে হইবে ম্লেচ্ছ ফিরিঙ্গি ডাকাতের হাতে তুলিয়া।

কিন্তু জয়ন্ত! তাঁর বড় আদরের মাতৃহীন সন্তান জয়ন্ত! একাধারে পিতা ও মাতার স্নেহে যাকে তিনি মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন—সেই ফুলের মত সুন্দর, নিষ্পাপ জয়ন্ত আজ ঐ ফিরিঙ্গিদের হাতে বন্দী। না জানি কী অমানুষিক নির্যাতনই না তাকে ঐ নরপশুদের হাতে সহ্য করিতে হইতেছে! হার না পাইলে জয়ন্তকে তারা ছাড়িবে না—হয়ত আরও নির্যাতন করিবে, শেষে হয়ত—হয়ত একদিন নরপিশাচগুলি তাকে হত্যা পর্যন্ত করিয়া শেষ প্রতিহিংসা গ্রহণ করিয়া বসিবে! ভাবিতেও মৃগাঙ্ক রায় শিহরিয়া উঠিলেন।

মন্দিরের পাষাণ-বেদীর সম্মুখে লুটাইয়া পড়িয়া ধনীর দুলাল প্রৌঢ় মৃগাঙ্ক রায় আজ যেন অনাথ শিশুর মতই দিশাহারা হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। অস্ফুটকণ্ঠে কহিলেন, 'ঠাকুর, তোমার সম্মানের জন্য আজ আমি নিজের প্রাণের চেয়েও প্রিয় জয়ন্তকে শত্রুর হাতে ফেলে রাখলাম। এতদিন যদি কায়মনোবাক্যে তোমার সেবা করে থাকি, তবে এ পরীক্ষা থেকে তুমিই আমাকে ত্রাণ করবে। আজ এই পরম সঙ্কট-মুহূর্তে আমাকে শুধু সহ্য করবার শক্তি দাও প্রভু!'

রাত তখন গভীর হইয়া আসিয়াছে। শেখর ঠাকুর দেবতার

আরতি শেষ করিয়া বহুক্ষণ চলিয়া গিয়াছেন। মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি থামিয়া গিয়াছে। অতিথিশালায় সাধু-বৈষ্ণবের দলও একে-একে শয্যা গ্রহণ করিয়াছে। মৃগাঙ্ক রায়ের চমক ভাঙিল, তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। মনে হইল, পাশের দুয়ার দিয়া একটি ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে মন্দিরের মধ্যে ঢুকিল। এত রাত্রে আবার কে মন্দিরে আসিল! মৃগাঙ্ক রায় বিস্মিত কণ্ঠে ডাকিলেন 'কে?' পরমুহূর্তে ছায়ামূর্তি ছুটিয়া আসিয়া ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে তাঁর পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল। সে আর কেউ নয়, সুশ্বেতা। আজ সারা রাত্রি সে রাধামাধবের পায়ে মাথা খুঁড়িবে পণ করিয়া চুপিচুপি মন্দিরে আসিয়াছে।

অমাবস্যা আসিল এবং চলিয়া গেল। মড়ার মাথা আর খোলা তলোয়ারের চিহ্ন-আঁকা নিশান লইয়া পর্তুগিজের শূন্য নৌকা সকলের অলক্ষ্যে বারোদীঘির ঘাট ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কেহ দেখিল না বা বাধা দিবার জন্য আগাইয়া আসিল না।

কিন্তু পর্তুগিজের নৌকা শূন্য চলিয়া গেলেও মৃগাঙ্ক রায়ের নিশ্বাস ফেলিবাব সময় ছিল না। নৌকা আটকানো বা অন্য কোনরূপ জুলুম করা তিনি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না—বিশেষত যতদিন জয়ন্ত উহাদের হাতে রহিয়াছে। গোপনে অনুসরণ করিয়াও যে বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে না তা তিনি জানিতেন। মন্দিরে দৈবক্রমে, হয়ত রাধামাধবেরই অনুগ্রহে, একবার তাঁর লাঠিয়ালরা ফিরিঙ্গি দলকে হঠাইয়া দিয়াছে বলিয়াই যে তাদের শক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে হইবে, এ দুর্বলতা বিচক্ষণ মৃগাঙ্ক রায়ের ছিল না। এই দুরন্ত হার্মাদদের তিনি চিনিতেন। বিশেষত জলপথে ইহাদের সহিত আঁটিয়া ওঠা, তিনি কোন্ ছার, স্বয়ং বাদশাহের ফৌজের পক্ষেও যে সহজ নয় তাহাও ও-অঞ্চলের কারও অজানা ছিল না। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এই হার্মাদের দল জলপথে ছিল অজেয়। সমস্ত নিম্ন ও দক্ষিণ বঙ্গ তাহাদের অত্যাচারে থর-থর করিয়া কাঁপিত। আশপাশের দু-দশটা

গ্রামে যতই প্রভাব প্রতিপত্তি থাকুক না কেন, মৃগাঙ্ক রায়ের মত জমিদারের পক্ষে একা এই পরাক্রমশালী শত্রুর সম্মুখীন হওয়া নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। কাজেই পর্তুগিজ নৌকা বিনা বাধায় বারোদীঘি ত্যাগ করিয়া গেল।

কিন্তু তারপর? মৃগাঙ্ক রায়ের দালানে সেদিন এই ব্যাপার লইয়াই গোপন পরামর্শ হইতেছিল। গ্রামের মাতব্বর ও জমিদারের হিতাকাঙ্ক্ষী কয়েকজন আসিয়াছিলেন—দেওয়ানজি, হরিচরণ, রসরাজ—ইঁহারাও ছিলেন।

বৃদ্ধ নকুলেশ্বর শর্মা কহিলেন, 'তাই তো, ফিরিঙ্গির সঙ্গে বিবাদ বাধানো, কাজটা বড় ভাল হল না। গ্রাম ছারখার না হয়ে যায়।'

'কিন্তু ওরাই তো যেচে এসে বিবাদ বাধিয়েছে। হার তো ওরাই যেচে বিক্রী করে গিয়েছিল, আবার ওরাই কিনা তা কাড়তে চাইল। তাও না-হয় একটা রফা করা যেত, কিন্তু যে মালা স্বয়ং রাধামাধবের গলায় দেওয়া হয়েছে, এখন আর তা কী করে খুলে নেওয়া যায়? সমস্ত বারোদীঘি উজাড় হয়ে গেলেও এ সম্ভব নয়।'

সকলেই এ কথায় সায় দিল। একজন কহিল, 'রাধামাধবই উপায় ঠিক করে দেবেন।'

রসরাজ বড় বিব্রত বোধ করিতেছিলেন। সমস্ত ব্যাপারটার গোড়ায় ঘটনাচক্রে তিনিই গিয়া পড়ায় সঙ্কোচটা তাঁহারই হইতেছিল বেশি। সেদিন শাঁখরাইলে নামিয়া মাদারপাড়ার চটিতে গিয়া ইলিশ মাছ খাইবার সাধ না হইলে এত অঘটনের কোনোটাই তো ঘটিত না! কিন্তু তাঁহারই বা হাত কী!

যাহাই হোক, আলোচনা অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিল। শীঘ্রই ফিরিঙ্গিদের সহিত একটা বড়-রকম লড়াইয়ের জন্য তৈরি থাকিতে হইবে ইহা সকলেই বুঝিলেন। এবং শুধু তাই নয়, জয়ন্তকে উদ্ধারের জন্যও অবিলম্বে আয়োজন করিতে হইবে।

'আচ্ছা', নকুলেশ্বর শর্মা হুঁকায় সুদীর্ঘ টান দিয়া কহিলেন,

'আশেপাশের জমিদারদের কেউ কি সাহায্য করতে পারে না?'

হরিচরণ বাধা দিয়া কহিল, 'ক্ষেপেছেন? শুধু-শুধু যেচে হার্মাদের সঙ্গে শত্রুতা ডেকে আনবে, এমন বোকা জমিদার এ তল্লাটে কেউ নেই। বরঞ্চ সবাই দূর থেকে মজা দেখবে। একমাত্র কন্দর্প চৌধুরী বেঁচে থাকলে কী হত বলা যায় না; লোকটার শত দোষ থাকলেও এসব বিষয়ে এগিয়ে আসত। তবে আমাদের সঙ্গে তাদের যে সম্পর্ক ছিল, তাতে সে বিষয়েও কী হত বলা যায় না। কিন্তু সে তো আর নেই! তার ছেলের কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল।'

হরিচরণের কথা ভাল করিয়া শেষ হইবার আগেই দেখা গেল একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত গোছের লোক ছিন্ন পাদুকা ও ছিন্ন ছাতা হাতে আগাইয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণ নিকটে আসিলে সকলেই তাঁকে চিনিল, ইনি আমাদের পূর্বপরিচিত হরিদাস ব্যাকরণবাগীশ।

ব্যাকরণবাগীশ নমস্কার জানাইয়া একটু বোকা-হাসি হাসিয়া কহিলেন, 'আঁজ্ঞে, আমি তাঁর ওখান থেকেই আসছি। আপনাদের সব খবর ভাল তো?'

কথার তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। ব্যাকরণবাগীশ আর একবার উপস্থিত সকলের কুশল-সমাচার সংগ্রহ করিয়া এবং নিজের ও নিজের সমুদয় আত্মীয়-স্বজনের কুশল-সংবাদ জ্ঞাত করাইয়া পরিশেষে জানাইলেন যে তিনি কন্দর্প চৌধুরীর পুত্রের ওখান হইতেই আসিতেছেন এবং মৃগাঙ্ক রায়ের সঙ্গে একটু নিরিবিলি কথা বলিতে চান।

মৃগাঙ্ক রায় মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। এমন একটা সঙ্কট মুহূর্তে এই অর্বাচীন ব্রাহ্মণ এভাবে সময় নষ্ট করিবে—ইহা অসহ্য। কিন্তু হাজার হোক, অতিথি, তায় ব্রাহ্মণ; তিনি কেদারাটি একপাশে টানিয়া লইয়া বলিলেন, 'বলুন, কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি। আমরা একটু বিশেষ কাজে ব্যস্ত ছিলাম।'

ব্যাকরণবাগীশ একবার 'ওঃ' শব্দটি উচ্চারণ করিয়া নির্বিকার চিত্তে

জানাইলেন যে তিনি সেই বিবাহ-প্রস্তাবটি সম্বন্ধেই আলোচনা করিতে আসিয়াছেন। রায় মশায় নিশ্চয়ই এতদিনে ব্যাপারটা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছেন। বাস্তবিকই, ঘরে-বরে এমন পাত্র এ দুর্দিনে পাওয়া কঠিন। কন্যাও তাঁহার বিবাহযোগ্যা হইয়াছে—ইত্যাদি।

মৃগাঙ্ক রায়ের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। এমন সময়, এই বিপদের মধ্যে এই মূর্খ কীভাবে সময় নষ্ট করিতে আসিয়াছে! একবার ইচ্ছা হইল, দ্বারোয়ান ডাকিয়া এখনই ঘাড়ে ধরিয়া উহাকে বাহির করিয়া দেন। কিন্তু প্রবল চেষ্টায় সে ইচ্ছা তিনি দমিত করিলেন। আজ এই বিপদের দিনে ব্রাহ্মণের অভিশাপ কুড়াইতে তাঁর সাহস হইল না। মুখ লাল করিয়া তিনি শুধু কহিলেন, 'আপনি অনর্থক এখানে সময় নষ্ট করছেন ঘটক মশাই! বিদেশী ডাকাতে যখন দেশ উজাড় করে দেয় তখন যে নরাধম ঘরে বসে শুধু বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডা দেয় আর শুধু বিয়ের স্বপ্ন দেখে, তার হাতে মেয়ে দেওয়ার চেয়ে মেয়েকে আমি বরং নদীর জলে ভাসিয়ে দেব। আচ্ছা আসুন, নমস্কার!' ব্যাকরণবাগীশের দিকে আর না চাহিয়া তিনি আবার পরামর্শে ডুবিয়া গেলেন।

•

এনায়েৎ খাঁ সপ্তগ্রামের একজন বড় সওদাগর। শুধু প্রচুর টাকার মালিকই নন, প্রভাব-প্রতিপত্তিও তাঁর যথেষ্ট। ফৌজদারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাও আছে। এই এনায়েৎ খাঁ মৃগাঙ্ক রায়ের বিশেষ বন্ধু। মৃগাঙ্ক রায় ঠিক করিলেন, আবার সপ্তগ্রামে গিয়া এই এনায়েৎ খাঁর সাহায্য গ্রহণ করিবেন।

কিন্তু মৃগাঙ্ক রায়ের স্বয়ং যাওয়া সম্বন্ধে সকলেরই আপত্তি উঠিল। রসরাজ কহিলেন, 'তোমার যাওয়া হতে পারে না রায় মশাই! ফিরিঙ্গিরা তোমাকে ভাল করে চিনে রেখেছে। গোপনে যাওয়া দরকার, কিন্তু তুমি গেলে গোপনে যেতে পারবে না। পথেই হয়ত এমন বিপদে পড়বে যাতে যাওয়া দূরে থাক, তোমার প্রাণ নিয়েই

হয়ত টানাটানি পড়বে। তা ছাড়া বারোদীঘির ওপর এখন ফিরিঙ্গিদের নজর রয়েছে। তুমি নেই জানলে তারা তার সুযোগ নিতে দেরি করবে না। জয়ন্তকে ধরে নিয়ে গেছে, সুশিকেও হয়ত ধরে নেবার চেষ্টা করা বিচিত্র নয়। তা ছাড়া রাধামাধবের মালাটি—যা নিয়ে আসল গোলমাল, সেটির জন্যেও তো তারা তাকে-তাকে আছে। না না,..তোমার যাওয়া হতে পারে না। বরঞ্চ আমিই যাব। সঙ্গে গোবিন্দকে দিও। এনায়েৎ খাঁ তো আমারও অপরিচিত নয়। তোমার বিয়ের সময় ও কি আমাকে কম জ্বালিয়েছিল ?'

অবশেষে সেইরকম করাই স্থির হইল। আর কালবিলম্ব না করিয়া সেইদিনই সন্ধ্যার পর রসরাজ কয়েকজন সঙ্গী ও সামান্য কিছু হাতিয়ার লইয়া সপ্তগ্রাম যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে গেলেন। সভা ভঙ্গ হইল।

ভিড়ের মধ্যে সকলের অলক্ষ্যে বসিয়া আরও একটি লোক যে পরামর্শটুকু শুনিয়া গেল, সেদিকে কেহ লক্ষ্য করিল না।

সপ্তগ্রামে ১১

সন্ধ্যা হয়-হয়। সরস্বতীর উপর দিয়া একখানি মাঝারি গোছের নৌকা পাল তুলিয়া তর-তর বেগে ঢেউ কাটিয়া ছুটিয়াছে। সরস্বতী নদী এখন নাই, বহুদিন হইল মজিয়া পৃথিবীর বুক হইতে লোপ পাইয়া গিয়াছে। ত্রিবেণীর কাছাকাছি ক্বচিৎ কোথাও তার লুপ্ত খাতের একটু-আধটু আভাস পাওয়া যায়। এখানে সেখানে খুঁড়িলে হয়ত একটা ভাঙা মাস্তুল, বৈঠা বা নোঙরের খানিকটা টুকরা পাওয়া যায়—আর প্রবীণেরা বলেন, এইখানে ছিল সেকালকার সরস্বতী নদী।

কিন্তু যেদিনকার কথা বলিতেছি সেদিনকার সরস্বতীর অবস্থা এ-রকমটা ছিল না। সরস্বতী তখনও ছিল কানায় কানায় ভরা। প্রথম

যৌবনের উদ্দাম চাঞ্চল্য না থাকিলেও তখনও তার দেহে জরার কোন চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই। বারো মাস তার বুকের উপর দিয়া ছোটবড় মহাজনী নৌকা ছুটাছুটি করিত। পাল তুলিয়া বড়-বড় জাহাজ চলিত। তাদের মাস্তুলের উপর নানা দেশের রকমারি নিশান ঠাণ্ডা হাওয়ায় পত-পত করিয়া উড়িত। আর সেই সরস্বতীর উপরেই ছিল সুবে বাংলার বিখ্যাত বাণিজ্য-নগরী সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ।

যে নৌকাটির কথা বলিতেছিলাম সেটিও চলিতেছিল সপ্তগ্রামের দিকে। মাঝি-মাল্লার হাবভাব দেখিয়া মনে হয়, বিশেষ জরুরি কাজেই তারা চলিয়াছে, দুদণ্ড বসিয়া জিরাইবার মত সময় কাহারও নাই।

খানিকটা গিয়া নদী একটি বাঁক নিয়াছে। নৌকা বাঁক ছাড়াইতেই দেখা গেল, অদূরে তিন-চারখানি বজরা ঝুপ্-ঝুপ্ করিয়া দাঁড় ফেলিয়া এদিকে আসিতেছে। প্রথমখানির সম্মুখে আধো-অন্ধকারেও স্পষ্টভাবে যে জিনিসটি চোখে পড়িতেছে—সেটি আর কিছুই নয়, একটি পিতলের তোপ।

নৌকা আর-একটু আগাইতেই বজরা হইতে গম্ভীর কণ্ঠে শব্দ হইল, 'নৌকা তফাৎ!' পরক্ষণেই আবার শোনা গেল—'ভিতরে কে?—কোথায় যায়?' নৌকার ভিতর হইতে এবার একটি গোলগাল গোছের লোক বাহির হইয়া আসিলেন, এবং কণ্ঠে খানিকটা বিনয় ঢালিয়া কহিলেন, 'নৌকো সাতগাঁয় যাবে। নবাবের দোস্ত। আপনারা কি সাতগাঁ থেকে আসছেন?' নৌকা ও বজরা তখন অনেকটা কাছাকাছি আসিয়া গিয়াছে। বজরার শব্দ এবার তাই অনেকটা নিচু খাদে নামিয়া আসিল, কহিল, 'নবাবের দোস্ত? ভাল কথা। কিন্তু সাবধান, আজ সাতগাঁয় গোলমাল আছে। রাত্রে নৌকো বন্দরে বাঁধবেন না।' পরক্ষণেই দূরে একটা ছপ্-ছপ্ শব্দ শোনা গেল—যেন একখানি ছিপ খুব দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। প্রথম বজরা হইতে এবার আরও মৃদুস্বরে শব্দ আসিল, 'এত জোরে আবার

কোথাকার ছিপ আসে ?' পিছনের আর-একটি বজরা হইতে কে কহিল, 'ছিপ নয়, কোশা বলে মনে হচ্ছে।'

'কোশা! কোশা কি এত জোরে যায় ?'

'ফিরিঙ্গির কোশা যায়। বোধহয় এ কোশা সাতগাঁর পানে ছুটেছে।'

এইখানে ছোট একটি খাল আসিয়া সরস্বতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। খালের ঠিক মুখে একটা বড় গাছ বোধহয় ঝড়েই উপড়াইয়া গিয়া জায়গাটাকে একটু ছায়াঘন করিয়া রাখিয়াছে। চক্ষের নিমিষে বজরা-কটি সরিয়া আসিয়া খালের মুখে সেই গাছের আড়ালে আত্মগোপন করিল, এবং নৌকাটিকেও আসিতে ইশারা করিল। খানিক পরে সত্যিই একখানি কোশা সম্মুখ দিয়া তেমনি দ্রুতগতিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল, অন্ধকারে বোধহয় ইহাদের দেখিতে পাইল না। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই, এক শত গজ পার হইতে না হইতে, গুম্-গুম্ করিয়া বারকয়েক বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল এবং সেই শব্দকেও তুচ্ছ করিয়া বিপন্ন কণ্ঠের করুণ আর্তনাদ সরস্বতীর স্নিগ্ধ বুক তোলপাড় করিয়া আকাশে মিলাইয়া গেল। খানিকক্ষণ ঝট্‌পট্ শব্দ, তারপর কোশা তেমনি বিদ্যুৎ-গতিতে সপ্তগ্রামের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বজরা হইতে চাপা গলায় শব্দ হইল, 'দেখলেন তো, ফিরিঙ্গিরা না জানি কোন্ হতভাগার নৌকো মেরে গেল। এ আমরা আছি কোন মুল্লুকে! অমন যে শাহান্-শা বাদশা—তাঁর ফৌজ পর্যন্ত এদের দেখলে ত্রাহি-ত্রাহি করে পালাতে চায়! হুগলীতে তো ফিরিঙ্গি-রাজ হয়ে গেছেই, সপ্তগ্রামেও এবার হয়ে গেল বলে; এখন বাকি রইল গৌড়। সেটি হলেই সোনায় সোহাগা!'

শত্রু দূরে চলিয়া যাওয়ায় সকলেরই আবার ধীরে ধীরে সাহস ফিরিয়া আসিতেছিল। বজরার মালিক এবার নৌকোর কাছে আসিয়া বলিলেন, 'কোথা থেকে আসছেন বললেন ? যেন একটু চেনা-চেনা

ঠেকছে!' গোলগাল লোকটি, ইনি আর কেহ নন—আমাদের রসরাজ মহাশয়। এবার আর গোপন করা অনাবশ্যক বুঝিয়া কহিলেন, 'বারোদীঘি থেকে।'

'বারোদীঘি? আমাদের মৃগাঙ্ক রায়ের দেশ? ও, তাই চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল! আপনাকেও এবার চিনতে পারছি মশাই। আপনিই তো বুঝি তাঁর বড় কুটুম্ব? আরে আমাকে চিনতে পারছেন না! আমি আবদুল আজিজ। আপনাদের গাঁয়ে যে আমি গেছি মশাই। তারপর, এমন দিনে সাতগাঁয় কেন? বোনাইটিকে কোথায় রেখে এলেন?'

রসরাজ চিনিলেন। আবদুল আজিজও সাতগাঁর একজন সমৃদ্ধিশালী বণিক। এনায়েৎ খাঁর মত প্রতিপত্তি না থাকিলেও উচ্চ রাজপুরুষ মহলে ইঁহারও খানিকটা খাতির আছে, মৃগাঙ্ক রায়ের সহিতও বন্ধুত্ব আছে। ইঁহার দ্বারা অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই, বরঞ্চ উপকার হইতে পারে। তিনি সংক্ষেপে তাঁর সপ্তগ্রাম যাত্রার কারণ জানাইলেন।

আবদুল আজিজের মুখ গম্ভীর হইল। 'তাই তো, ফিরিঙ্গিগুলো তবে রায় মহাশয়ের মত ভাল মানুষের পেছনেও লেগেছে! বড় মুশ্‌কিল তো! ও বেটাদের অসাধ্য কিছু নেই! হুগলীর ফিরিঙ্গি সেনাপতি লোকটিকে যদিও বা বাগানো যায়, ওদের ওই পাদ্রিগুলোকে সামলানো দায়। ধর্মের নামে যা কাণ্ড লাগিয়েছে! সাতগাঁয়ে গেলেই টের পাবেন। হাঁ, যাচ্ছেন যান, কিন্তু রাত্রে বন্দরে নৌকো লাগাবেন না। বরঞ্চ দু-কোশ দক্ষিণে ফকির সাহেবের দরগার পাশে যে ভাঙা ঘাট আছে সেখানে নেমে রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি শহরে ঢুকবেন। কিন্তু সাবধান; শহর আজ বারুদখানা হয়ে আছে!'

রাত্রির প্রথম প্রহরেই রসরাজের নৌকা ফকির সাহেবের ভাঙা ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। ঘাটের ঠিক উপরেই একটা প্রকাণ্ড

নিমগাছ—তার মাথার আধখানা জলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। সন্ধ্যার পর যতরাজ্যের পাখি আসিয়া তার উপর ভিড় করে। ঘাটে এক সময় বাঁধানো সিঁড়ি ছিল, কিন্তু সময়ের অত্যাচারে এবং লোকের অব্যবহারে তার অনেকখানিই এখন নাই, সরস্বতী নদীও খানিকটা ভাঙিয়া নিজের কুক্ষিগত করিয়াছে। যে-কয় ধাপ আছে তাও নানারকম শ্যাওলা ও আগাছায় ভর্তি।

নৌকা ঘাটে লাগিতেই গোবিন্দ লাফ দিয়া নামিয়া পড়িল। তারপর একে-একে আর দুটি সঙ্গী নামিয়া রসরাজকেও হাতে ধরিয়া নামাইয়া লইল। মাঝিদের একজন জিজ্ঞাসা করিল, 'নৌকো তা হলে, কত্তা, কোথায় রাখব? ঘাটেই?'

'না না, ও-কাজটি কোরো না। ভাঙা ঘাট হলেও এখানকার কোন জায়গাই নিরাপদ নয়—বিশেষত আজিজ সাহেবের উপদেশ শোনবার পর। নৌকো কাছেই কোথাও আঘাটায় রাখ, আর তোমরা নৌকোতেই থাক। রাতে একটু সজাগ থেকো।'

রসরাজ আর তিনজন অনুচর লইয়া ধীরে ধীরে শহরের দিকে আগাইয়া চলিলেন। সঙ্গে কিছু হাতিয়ার লইতেও ভুলিলেন না।

অনেকখানি আগাইবার পরও যেন শহরের কর্ম-কোলাহল কানে আসিল না। সপ্তগ্রাম তখন বাংলার শ্রেষ্ঠ বন্দর; শহর হিসাবে এক গৌড় ছাড়া তার জুড়ি মেলা ভার। নানা দেশের লোক এখানে বাস করে, গভীর রাত পর্যন্ত পথঘাট জনসমাগমে গম্-গম্ করে। সন্ধ্যার পর প্রধান সড়কগুলিতে সারিবদ্ধ অসংখ্য দোকানে যখন আলো জ্বলিয়া উঠে তখন নূতন লোকের কাছে উহা দেওয়ালি উৎসব বলিয়া ভুল হইতে পারে। সে আলোক-সজ্জা বহুদূর হইতে চোখে পড়ে।

আজ কিন্তু তার কোনটাই যেন চোখে পড়িতেছে না। দোকান-পাট সমস্তই বন্ধ। রাস্তার মোড়ে ক্বচিৎ কোথাও সরকারি আলোকস্তম্ভ ছাড়া কোনও আলো চোখে পড়িতেছে না। গৃহস্বামী-রাও বোধহয় দরজায় খিল দিয়া রহিয়াছে। যেখানে লোকের ভিড়ে

পা টিপিয়া-টিপিয়া হাঁটিতে হইত, চীৎকার করিয়া কথা না বলিলে পাশের লোক শুনিতে পাইত না, সেখানে আজ দ্রুতপদে ছুটিয়া চলিলেও কারো সঙ্গে ধাক্কা লাগিবার ভয় নাই, ফিস্‌-ফিস্‌ করিয়া কথা বলিলেও বহুদূর হইতে তা শোনা যায়।

রসরাজ ডাকিলেন, 'গোবিন্দ।'

'আজ্ঞে?'

'ব্যাপারখানা কী বল তো? এ যে কেমন-কেমন ঠেকছে!'

'আজ্ঞে, তাই তো দেখছি। চলুন না একটু এগিয়ে সদর-ঘাটের কাছাকাছি আর-একটু। তেমন বিপদ হলে গা-ঢাকা দেওয়া যাবে। তা ছাড়া সকলের হাতেই হাতিয়ার আছে।'

কিন্তু সদরঘাট পর্যন্ত যাইতে হইল না, মোড় পার হইতেই দূরে একটি ছোটখাট জনতা চোখে পড়িল। আর-একটু আগাইতেই ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝা গেল।

তিন-চারটি পর্তুগিজ সৈন্য একটি নেড়া মাথা বৈরাগীর গলায় নামাবলী দিয়া টানাটানি করিতেছে। বৈরাগী কিছুতেই যাইবে না, তারাও নাছোড়বান্দা। ভিড়ের মধ্যে দুই-একটি লোক বৈরাগীর পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া প্রচণ্ড হুমকি খাইতেছে।

রসরাজের বেশভূষা দেখিয়া বৈরাগীর যেন একটু সাহস হইল, সে তাহাকেই সালিস মানিয়া অত্যাচার হইতে রেহাই দিবার জন্য কাকুতি মিনতি শুরু করিল। তাহার নিকট হইতে অস্পষ্টভাবে যেটুকু শোনা গেল তাতে জানা গেল, ফিরিঙ্গিরা বৈরাগীটিকে হুগলী কিংবা অন্য কোন কেল্লায় লইয়া যাইতে চায়—সেখানে গিয়া তাকে প্রেম-ধর্মে দীক্ষা দিবে। কয়েকদিন আগে হুগলীর ঘাটে নাকি বৈরাগীটি তাহাদের জনৈক পাদ্রির নিকট ঐরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল এবং তৎপরিবর্তে নানা মূল্যবান উপঢৌকন লইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু বৈরাগী তাহা স্বীকার করিতেছে না। সে নাকি নবদ্বীপের লোক, মাত্র আজ বৈকালে সপ্তগ্রাম পৌঁছিয়াছে। হুগলীতে সে জীবনে যায় নাই;

ফিরিঙ্গিরা হয় লোক ভুল করিতেছে, নয় মিথ্যা বলিতেছে।

তার কথা শেষ হইতে-না-হইতেই সম্মুখের সৈনিকটি তার নাকের উপর প্রবল এক ঘুসি বসাইয়া দিল। গল্-গল্ করিয়া রক্ত বাহির হইয়া বৈরাগীর নামাবলী রঞ্জিত করিয়া দিল।

রসরাজের আর সহ্য হইল না। এই ফিরিঙ্গিগুলির উপর আগে হইতেই তাঁর রাগ চড়িয়া ছিল, বৈরাগীর মুখ দেখিয়া সে যে মিথ্যা বলিতেছে এমন মনে হইল না। তিনি কঠোর কণ্ঠে কহিলেন, 'বেশ তো, রাতের অন্ধকারে ধরে নেবার কী তাড়াতাড়ি? যদি আপনাদের কথা ঠিক হয়, এ তো বাদশার রাজত্ব,—এখানে অনেক বড়-বড় রাজ-কর্মচারী আছেন, ফৌজদার আছেন, তাঁদের কাছে বলে-কয়েই নিয়ে যেতে পারেন।'

ফৌজদারের নাম করিতে যেন আগুনে ঘৃতাহুতি পড়িল। সৈনিকরা বৈরাগীকে ছাড়িয়া চোখ পাকাইয়া রসরাজের দিকে আগাইয়া আসিল। তারপর প্রথম সৈনিকটি সজোরে তাঁর মিরজাই-এর সম্মুখের অংশ মুঠা করিয়া ধরিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, 'তবে রে মোট্‌কা, তুই আবার কোন্ গাছ থেকে নেমে এলি? তোদের ফৌজদার তো আমাদের কী রে? আমাদের যা-খুশি করব, তোর ফৌজদারের গরজ থাকে, সে যেন হুগলী যায়। আমাদের অ্যাডমি-র‍্যালের পায়ে ধরে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে।' তারপর সঙ্গীদের লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'চল, এ ব্যাটাকেও ধরে নিয়ে যাই। ব্যাটা পুতুল-পুজোর ফলার খেয়ে-খেয়ে চেহারা বাগিয়েছে দেখ না!'

সৈনিক আরও কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু তার কথা শেষ হইতে-না-হইতে একটা প্রকাণ্ড লাঠি সজোরে তার কাঁধের উপর আসিয়া পড়িল। কিছু বুঝিবার আগেই সে ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। রসরাজ ফিরিয়া দেখেন, পিছনে গোবিন্দ,—আবার সে লাঠি তুলিয়াছে।

এদিকে জনতা তখন ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। একজন ছুটিতে ছুটিতে বলিল, 'এ কী করলেন মশাই! আজ যে সাতগাঁ ফিরিঙ্গিতে

ভর্তি! ফৌজদারের সৈন্যদের সঙ্গে দুপুরে তাদের ভীষণ দাঙ্গা হয়ে গেছে! বহু দোকান-পাট লুট হয়েছে। আবার ওদের ঘাঁটালেন!'

পর্তুগিজ সৈন্যেরা তাদের সঙ্গীকে আচম্‌কা আহত হইতে দেখিয়া প্রথমটা ভ্যাবাচাকা খাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই তারা সে-ভাব কাটাইয়া উঠিল এবং পরমুহূর্তে কাঁধের বন্দুক টানিয়া রসরাজের দলটির দিকে বাগাইয়া ধরিল।

এক মুহূর্তের জন্য রসরাজের চোখে সমস্ত ঝাপসা হইয়া গেল, কিন্তু এক মুহূর্ত মাত্র। পরক্ষণেই পিছনের সৈনিকটি হুমড়ি খাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তারপর চোখের নিমেষে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সৈনিকেরও সেই দশা ঘটিল। রসরাজ চাহিয়া দেখিলেন, অন্তরীক্ষ হইতে,—অনেকটা শিলাবৃষ্টির মতই অব্যর্থ কয়েকটি তীর আসিয়া ফিরিঙ্গি কয়টিকে বিদ্ধ করিয়াছে। তিনি আর দাঁড়াইলেন না, সঙ্গীদের অনুসরণ করিতে ইশারা করিয়া তীরের বেগে শহরের দিকে দৌড় দিলেন; মুখ দিয়া যেন অলক্ষ্যেই বাহির হইল, 'রাধামাধব, রাধামাধব!'

চন্দনা, ফিরিঙ্গির চক ও সপ্তগ্রাম ১২

চন্দনা গ্রামে বেলা তখন এক প্রহর পার হইতে চলিল। ভোরের সূর্য মাথা তুলিতে তুলিতে অনেকখানি উপরে উঠিয়া গিয়াছে। গ্রামের সর্বত্রই দৈনন্দিন কর্ম-কোলাহল শুরু হইয়াছে, শুধু জমিদার-বাড়ির একখানি ঘরে যেন তখনও রাত কাটে নাই। ঘর ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। ভিতরে গৃহস্বামী তখনও আরামে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছেন। গৃহস্বামী আর কেহ নন, চন্দনার খোদ জমিদার নন্দ চৌধুরী।

ভৃত্য আসিয়া বার-কয়েক দরজা পরীক্ষা করিয়া গিয়াছে, দু-একবার সাহস করিয়া মৃদু করাঘাতও করিয়াছে কিন্তু ভিতর হইতে

কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। লোকটা এত ঘুমাইতেও পারে!

কিন্তু সব জিনিসেরই সীমা আছে, শেষ পর্যন্ত নন্দ চৌধুরীরও ঘুম ভাঙিল। বার-কয়েক হাই তুলিয়া, দু-বার আড়মোড়া ভাঙিয়া তরুণ জমিদার উঠিয়া বসিলেন। ভৃত্য আসিয়া নিবেদন করিল, বৈঠকখানায় দর্শনপ্রার্থীরা ইতিমধ্যেই আসিয়া গেছে। ব্যাকরণবাগীশও তাদের মধ্যে একজন। রাসবিহারী শিবনাথ প্রভৃতি বন্ধুরাও আছে। নন্দ সে-কথায় বিশেষ আমল না দিয়া পাশের ঘরে বেশ পরিবর্তন করিতে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা আহ্নিকের বালাই তার কোনদিনই নাই, পরিপাটি রকম জলযোগের আয়োজন থাকিলেই সে খুশি। জলযোগান্তে আরও কিছুক্ষণ সময় কাটাইয়া সে বৈঠকখানায় গিয়া বসিল।

'বসিল' না বলিয়া শুইল বলিলেই ঠিক বলা হয়। বেশিক্ষণ বসিয়া থাকিবার পাত্র সে নয়। রেশমি চাদরের উপর মখমলের তাকিয়া সর্বদাই প্রস্তুত আছে, তারই উপর দেহভার এলাইয়া দিয়া একটিপ নস্য সজোরে নাকের দুই গহ্বরে দিয়া নন্দ চৌধুরী কথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

প্রথমে কথা কহিল রাসবিহারী। সে বেশ উত্তেজিত হইয়া আছে। কহিল, 'চৌধুরী মশাই, এবার একটা বিহিত না করলে তো আমাদের চন্দনা গাঁয়ের আর মুখ থাকে না!'

নন্দ অলস দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, 'কী রকম?'

'এই শুনুন ব্যাকরণবাগীশ মশাইয়ের কাছে। কাল মৃগাঙ্ক রায়ের কাছে কথাটা ফের পাড়তে গিয়েছিলেন উনি। রায়মশাই কথা তো কানে তোলেনই নি, উল্টে যাচ্ছেতাই করে অপমান করে দিয়েছেন আপনাকে। বল না হে ব্যাকরণবাগীশ, চুপ করে রইলে কেন?'

ব্যাকরণবাগীশ কুশল প্রশ্ন না করিয়া বড়-একটা কথা শুরু করেন না। থতমত খাইয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ, বড্ড যা-তা বললেন। অবশ্য মনটা হয়ত একটু খারাপ ছিল; ছেলের ঐ বিপদ—'

'ছেলের আবার কী বিপদ হল?' শিবনাথ বিস্মিত ভাব দেখাইয়া প্রশ্ন করিল।

'জানেন না বুঝি? তাকে যে ফিরিঙ্গিরা ধরে নিয়ে গেছে। রাধামাধবের সেই মালা না পেলে ছাড়বে না। আর, দেরি হলে নাকি খতম করে দেবে বলে শাসিয়েছে।'

সংবাদে উপস্থিত সকলেই যেন একটু অবাক হইল। কিন্তু নন্দ চৌধুরীর মুখে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। তেমনি নিষ্ক্রিয়, উদাসীন দৃষ্টি মেলিয়া সে শুধু বলিল, 'তাই নাকি? তা মালাটা দিয়ে দিলেই তো পারে, অত গোলমালে যাবার কী দরকার?'

আসল কথাটা চাপা পড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া রাসবিহারী কথার মোড় ফিরাইয়া কহিল, 'সে যাক্ গে, তাঁদের ছেলে তাঁরা যা খুশি করুন আমাদের তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আমাদের জমিদারকে অপমান করলে আমরাও যে ছেড়ে কথা কইব না তা তাদের জানিয়ে দেওয়া দরকার।'

নন্দ চৌধুরী পুনরায় একটিপ নস্য লইয়া কহিল, 'কী আর বলেছে! যেতে দাও, যেতে দাও।'

কিন্তু রাসবিহারী থামিল না, উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, 'কিন্তু সব কথা আপনি শোনেন নি চৌধুরী মশাই। শুনলে মরা মানুষও রাগে লাফিয়ে উঠবে। বল না হে ব্যাকরণবাগীশ! তুমিও যে চুপ করে গেলে! এতক্ষণ তো দিব্যি ফড়্ ফড়্ করছিলে!'

ব্যাকরণবাগীশ তখন ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা বলিয়া গেলেন। মৃগাঙ্ক রায়ের সঙ্গে তাঁর কী কথা হইয়াছে, কী জবাব দিয়াছেন তিনি ইত্যাদি। শুনিয়া সকলেরই মুখ গম্ভীর হইল।

রাসবিহারী ফরাসে প্রচণ্ড এক চড় মারিয়া কহিল, 'এ আমরা সইব না! মৃগাঙ্ক রায়ের থোঁতা মুখ ভোঁতা করবই! সোজাসুজি না হয়, ফন্দি-ফিকির আমরাও জানি। দরকার হলে শত্রুতা করতেও পিছপা হব না। তবে শুনুন চৌধুরী মশাই। ব্যাকরণবাগীশ

এখনও সবটা বলে নি। রায়েদের গোপন পরামর্শের কথা। ফিরিঙ্গিদের কাছে খবরটা হয়ত মন্দ লাগবে না!' বলিয়া রাসবিহারী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ব্যাকরণবাগীশের দিকে আড়চোখে চাহিল। ব্যাকরণবাগীশ উঠিয়া সযত্নে দরজাটি ভেজাইয়া দিলেন। তারপর অত্যন্ত চাপা কণ্ঠে নিজের বক্তব্য বলিয়া গেলেন। ইহার পরে ঘরে আর যেসব কথাবার্তা চলিল তাহাও হইল তেমনি চাপা কণ্ঠে। শুধু থাকিয়া থাকিয়া রাসবিহারীর কণ্ঠস্বরে কিছু প্রচ্ছন্ন পুলকের ভাব ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

দৃশ্যটা বদলাইয়া আমাদের এবার যাইতে হইবে ফিরিঙ্গির চকে। পর্তুগিজ দুর্গের পশ্চিমাংশে যে ঘরটিতে পাদ্রি বারেটোর সঙ্গে আমাদের দেখা হইয়াছিল সেই ঘরটির কথাই বলিতেছি। আজও সেখানে আমাদের পূর্বপরিচিত সেই দুটি লোক ছাড়া আর কেহ নাই।

বারেটোর হাতে দুটি পানপাত্র। আজও তা হইতে ফেনিল রস গড়াইয়া পড়িতেছে। একটি পাত্র সম্মুখে আগাইয়া দিয়া অপর পাত্রটি তিনি নিজের মুখের উপর উপুড় করিয়া দিলেন। দীর্ঘ শ্মশ্রু বাহিয়া ঘন রস গড়াইয়া পড়িল। বারেটো কহিলেন, 'তুমি আপত্তি কোরো না বিব্বু! এ ছাড়া আর উপায় নেই। কৌশল ছাড়া এখন কোন কাজ হবে না। এ ভার তোমাকে নিতে হবে। এদিকে চাঁদপাল চিঠির পর চিঠি পাঠাচ্ছে।'

'ছেলেটিকে দিয়ে কিছু হল না বলুন?'

'তাঁর কথা আর বোলো না! এমন বেয়াড়া ছেলে আমি ভূ-ভারতে দেখি নি। অতটুকু ছেলে, মেরে পাট করে দিলাম, অথচ একটা কথা বলাতে পারলাম না!'

বিব্বু কি ভাবিল, তারপর কহিল, 'রেখে দিন, ভবিষ্যতে হয়ত কাজ দেবে। না দেয়, ধরে একদিন খতম করে দেবেন। কিন্তু আপনি যা বলছিলেন—অমন লোক পাই কোথা?'

'পেতেই হবে। টাকা ছাড়লে কী না হয়? আমরা সেই সাত সমুদ্দুরের ওপারের লোক হয়েও তো এ দেশে এত লোক পেয়েছি! এই পরশু খবর পেলাম হুগলীতে আরও কয়েকটি দেশী লোক পবিত্র প্রেম-ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। লোক তুমিই জোগাড় করবে।'

বিব্বু কি ভাবিতে লাগিল। বারেটো তার পিঠে মৃদু মৃদু কয়েকটি করাঘাত করিয়া কহিলেন, 'ব্যস আর কথা নয়। লক্ষী ছেলেটির মত এবার কাজের ব্যবস্থা কর গিয়ে দেখি! এই নাও, এগুলো এখন তোমার কাছে রেখে দাও।' বারেটোর জামার ভিতর হইতে কয়েকটি মোহর টানিয়া বাহির করিয়া বিব্বুর হাতে গুঁজিয়া দিলেন। বিব্বুর মুখে এইবার হাসি ফুটিল।

ফিরিঙ্গির চক পিছনে রাখিয়া আবার আমাদের সপ্তগ্রামে ফিরিয়া আসিতে হইল।

সপ্তগ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পল্লীতে এনায়েৎ খাঁর বাড়ি। বাড়ি না বলিয়া প্রাসাদ বলিলেই ঠিক বলা হয়। এনায়েৎ খাঁ এখানকার মস্ত বড় ব্যবসায়ী—বিখ্যাত ধনী। শুধু অর্থের দিক দিয়াই তিনি বড় নন, সামাজিক প্রতিপত্তিও তাঁর বড় কম নয়। তাঁর আত্মীয়-স্বজন বেশির ভাগই উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত। এই এনায়েৎ খাঁ মৃগাঙ্ক রায়ের বিশেষ বন্ধু—এবং সে বন্ধুত্ব বহুদিনের। ইঁহারই সাহায্যপ্রার্থী হইয়া রসরাজ সপ্তগ্রামে আসিয়াছেন, তা আমরা আগেই শুনিয়াছি।

যে রাত্রে রসরাজ তাঁর সঙ্গীদের লইয়া সপ্তগ্রামের পদার্পণ করেন এবং ঘটনাচক্রে পর্তুগিজদের সঙ্গে বিবাদ বাধাইয়া রহস্যজনক ভাবে রক্ষা পান তারপর আরও দুদিন কাটিয়া গিয়াছে। সপ্তগ্রামের অবস্থা এ দুদিন বিশেষ ভাল যায় নাই। ফৌজদারের সৈন্যদের সহিত পর্তুগিজদের সঙ্ঘর্ষের কথা আগেই বলিয়াছি। তারপর সেদিন রাত্রে অজ্ঞাত আততায়ীর তীরে আহত পর্তুগিজ-সৈন্য কয়টিকে লইয়া আবার গোলযোগ বাধিয়াছে। খবর পাইয়া পরদিনই হুগলী

হইতে নতুন একদল সশস্ত্র পর্তুগিজ সপ্তগ্রামে গিয়া চড়াও হইয়াছে এবং মারধোর, লুঠতরাজ ইত্যাদি শুরু করিয়া জনসাধারণের উপর অকথ্য অত্যাচার জুড়িয়া দিয়াছে। ফৌজদারের সৈন্যেরাও চুপ করিয়া থাকে নাই, তারাও অনেক পর্তুগিজকে ঘায়েল করিয়াছে। ফলে সমস্ত শহরময় একটা বিশৃঙ্খলা এবং আতঙ্ক ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

রাস্তায় লোকজন খুব বেশি নাই। দিনের বেলাও লোকে তটস্থ হইয়া চলিতেছে। গাছ হইতে একটা পাতা খসিয়া পড়িলে সে শব্দেও আঁৎকাইয়া উঠিতেছে। কর্মব্যস্ত সাতগাঁর লোকেরা এমন দৃশ্য দেখিতে বড়-একটা অভ্যস্ত নয়।

এনায়েৎ খাঁর বৈঠকখানায় রসরাজ একা বসিয়া গৃহস্বামীর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ভৃত্য অনেকক্ষণ হয় সুগন্ধি তামাক সাজিয়া ব্রাহ্মণের গড়গড়াটি পাশে রাখিয়া গিয়াছে। চিন্তামগ্ন রসরাজের সেদিকে খেয়াল নাই। বসিয়া বসিয়া তিনি আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিলেন। এনায়েৎ খাঁ ফৌজদারের কাছে গিয়াছেন। কী সংবাদ লইয়া আসেন বলা যায় না। এদিকে যে জরুরি কাজ লইয়া তিনি আসিয়াছেন, তাহাতেও এখানে আর একদিনও দেরি করা সমীচীন নয়। জয়ন্ত এখন কোথায়, কী অবস্থায় আছে কে জানে! দেরি হইলে তার কী বিপদ ঘটে তাহাও বলা যায় না। একে তো ধরিতে গেলে রসরাজের জন্যই মৃগাঙ্ক রায়ের আজ এই বিপদ, তার উপর আবার তাঁরই অপটুতায় যদি জয়ন্তের কোন নতুন বিপদ ঘটিয়া যায় তবে আর রসরাজ বারোদীঘিতে মুখ দেখাইতে পারিবেন না।

মাদারপাড়ার সেই চটির কথা মনে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল সেই ইলিশ মাছের কথা,—স্বাদটা যেন আজও মুখে লাগিয়া আছে। সপ্তগ্রামে আসিয়া এই গোলযোগে খাওয়া-দাওয়ার মোটেই জুত হইতেছে না। বাজারে জিনিসপত্র কিছুই প্রায় মেলে না। জেলেরা ফিরিঙ্গির ভয়ে সরস্বতীতে পর্যন্ত জাল ফেলিতে আসে না। আচ্ছা

ফ্যাসাদ জুটিয়াছে এই ফিরিঙ্গিগুলি! ছিলি নিজের দেশে, বেশ ছিলি। গরু খাইতিস, মহিষ খাইতিস—শুয়োর খাইতিস, কেহ বাধা দিত না। সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিয়া বাংলাদেশে আসিয়া উৎপাত করিবার কী এমন দরকার ছিল তোদের? তা আসিয়াছিস ভালভাবে থাক—খা, দা,—এমন ইলিশ মাছ,—জন্মে যার মত জিনিস তোদের দেশে কেউ কল্পনা করিতে পারে না, তাও দিতেছি,—চাখিয়া দেখ, তা না, মার-ধোর, দাঙ্গা-হাঙ্গামা! এ সব কী রে বাপু!

সহসা চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল ঘোড়ার খুরের শব্দে। শব্দ যেন তাঁহারই অনতিদূরে আসিয়া থামিল। রসরাজ চোখ তুলিয়া দেখিলেন, প্রৌঢ় এনায়েৎ খাঁ ঘোড়া হইতে নামিয়া ধীরপদে আগাইয়া আসিতেছেন। আশা ও নিরাশার সন্দেহ-দোলায় রসরাজের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

শেখরেশ্বরের শিষ্যলাভ ১৩

বারোদীঘির জমিদার-বাড়ি হইতে কি দক্ষিণে জঙ্গলের ভিতর দিয়া একটা সরু পায়ে-চলা পথ। দুধারে উঁচু বনতুলসীর ঝোপ, এধারে ওধারে দু-চারিটা কাঁটা গাছ, মনসা গাছ, নয় তো বাবলার ঝাঁক। মাঝে-মাঝে পত্রবহুল বট-পাকুড়ও আছে। পথটি বড় নিরিবিলি। পথের ধূলা ভেদ করিয়া এখানে-ওখানে দুর্বা ঘাস গজাইয়া জানাইয়া দিতেছে, এ পথে লোক-চলাচল বেশি হয় না।

বেলা তখন দুপুর গড়াইয়া আসিয়াছে। এই জনবিরল পথ দিয়া একজন স্থূলকায় ব্রাহ্মণ হন্-হন্ করিয়া হাঁটিয়া আসিতেছিলেন—অবশ্য মেদবহুল দেহ লইয়া যতটা তাড়াতাড়ি হাঁটা যায়। ব্রাহ্মণের পরনে সুচিক্কণ পট্টবস্ত্র, হাতে নামাবলী দিয়া জড়ানো একটি পুঁটুলি, কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। ব্রাহ্মণটিকে আমরা আরও একবার দেখিয়াছি। ইনি আর কেহ নন,—শেখরেশ্বর গোস্বামী—রাধামাধব-মন্দিরের পূজারী। পূজা সারিয়া বাড়ি ফিরিতেছেন।

শেখর ঠাকুরের বাড়ি মন্দির হইতে সোজা রাস্তা দিয়া গেলে বেশি পথ নহে, কিন্তু মন্দ কপাল-বশত প্রায়ই তাঁকে সোজা রাস্তা ছাড়িয়া, ঝোপ জঙ্গল ভাঙিয়া, অনেক ঘোরা পথে বাড়ি ফিরিতে হয়। শেখর ঠাকুরের বিবাহ-বাতিকের কথা সকলেই জানে এবং তাঁর বর্তমান ব্রাহ্মণীরা সে সাধে বাদ সাধিবার জন্য কেমন করিয়া গ্রামের দুষ্ট ছেলে-দের হাত করিয়াছেন সে কথাও ইতিপূর্বে তোমাদের বলিয়াছি। এই বালক-শত্রুদের এড়াইবার জন্যই শেখর ঠাকুরকে মাঝে-মাঝে সদর রাস্তা ছাড়িয়া ঝোপ-জঙ্গল ভাঙিয়া বাড়ি ফিরিতে হয়। আজও তিনি তাই করিতেছিলেন।

পথ জনশূন্য। এধারে ওধারে এক-একটা ফড়িং কম্পমান পাখা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, দূরে একটা ঘুঘু অবিশ্রাম ডাকিয়া চলিয়াছে। আর কোথাও কোন জীবন্ত প্রাণীর ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। শেখর ঠাকুর হন্-হন্ করিয়া চলিয়াছেন।

হঠাৎ মনে হইল, দূরে গাছের আড়ালে আড়ালে কে একজন তাঁহারই দিকে আসিতেছে। নাঃ, ছোঁড়াগুলির জ্বালায় আর পারা গেল না! কাল হইতে আরও ঘুরিয়া গণেশদীঘির ধার দিয়া ফিরিতে হইবে। একটু দেরি হইবে, তাছাড়া ও পথে সাপখোপেরও একটু উৎপাত আছে, কিন্তু এর চেয়ে তাও ভাল। যাই হোক, আপাতত একটু গা-ঢাকা দেওয়াই শ্রেয়। শেখব ঠাকুর রাস্তা ছাড়িয়া জঙ্গলে ঝোপের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন।

লোকটি আরও কাছে আসিল। একেবারে ছেলে-ছোকরা নয়, বয়স কুড়িয়ের কোঠায় হইবে। পিঠে একটা বড় পুঁটুলি; গায়ে চাদর জড়ানো। শেখর ঠাকুর দূর হইতে তাকে চিনিতে পারিলেন না, সম্ভবত এ গাঁয়ের কেহ নয়। তবে এ-পথে কেন?

লোকটি চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া গেল। বোধহয় সে শেখর ঠাকুরের খোঁজেই আসিতেছিল। হঠাৎ পথের মধ্যে তাঁকে অদৃশ্য হইতে দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছে।

শেখর ঠাকুর দর্শন দিবেন কি না ভাবিতে লাগিলেন। লোকটির কী মতলব জানা নাই। তবে গাঁয়ের অকালপক্ক ছোঁড়াদের সহকর্মী বলিয়া তাকে মনে হইল না। পথ হারাইয়া এ দিকে আসিয়াছে কি? কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবিবার অবসর তাঁর হইল না। মশার মত এক রকম উড়ন্ত পোকা তাঁহাকে ছাঁকিয়া ধরিয়াছে। এই বনতুলসীর ঝোপ তাদেরই রাজত্ব। রবাহূত আগন্তুককে তারা চায় না—তা তিনি যত বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই হউন না কেন। শেষে ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া উঃ আঃ করিতে করিতে তিনি ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন—একেবারে আগন্তুকের মুখোমুখি।

লোকটি কিন্তু বেশ হাসিখুশি। পথশ্রমে ক্লান্ত, তার উপর পিঠের বোঝাটিও বেশ ভারী, কিন্তু সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নাই। নমস্কার করিয়া কহিল, 'ঠাকুর মশাই, আমি অনেক দূর থেকে আসছি। এখানে এসে রাস্তা গোলমাল করে ফেলেছি। আপনি বলতে পারেন এখানে শেখর ঠাকুরের বাড়ি কোন্ দিকে?'

'কার?—কার বাড়ি?'

'শেখর ঠাকুর। পণ্ডিত শেখরেশ্বর গোস্বামী। রাধামাধব-মন্দিরের পুরোহিত।'

শেখর ঠাকুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার আগন্তুকের মুখের দিকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। তারপর একটু থামিয়া, ক্ষণেক ইতস্তত করিয়া বলিলেন, 'আমারই নাম শেখরেশ্বর গোস্বামী।'

লোকটির মুখে এবার তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠিল। পুঁটলিটি নামাইয়া পথের উপরেই সে সাড়ম্বরে শেখর ঠাকুরের পায়ের ধূলা লইল। কহিল, 'অনেক দূর থেকে আসছি আপনার কাছে। আমাদের বাড়ি হুগলী জেলায়। কাঁঠালপাড়ার নাম শুনেছেন বোধ-হয়? তারই কাছে সিমলাই গাঁয়ে। আমরাও ব্রাহ্মণ।'

শেখরেশ্বর একটু বিব্রত কণ্ঠে কহিলেন, 'ও!'

আগন্তুক বুঝিল ঠাকুর ক্লান্ত। কহিল, 'চলুন, হাঁটতে হাঁটতে

কথা হবে। আপনার বোধহয় দেরি হয় গেছে। এ পথে নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি বাড়ি যাওয়া যাবে? আমি আবার এদিককার কিচ্ছু চিনি না!'

শেখর ঠাকুর বুঝিলেন, এবারে কিছু একটা বলা দরকার। কহিলেন, 'হ্যাঁ, ঐ ঝোপের ভিতর দিয়ে গেলে আরও তাড়াতাড়ি যাওয়া যেত—কিন্তু ওদিক্‌টায় বড্ড—হেঁ হেঁ!'

চলিতে চলিতে ব্রাহ্মণ যুবক আত্মপরিচয় দিল। তার নাম শশীকান্ত। দেশে অল্পস্বল্প ভূ-সম্পত্তি আছে, কিছু যজমানও আছে। কিন্তু অল্প বয়সেই সে পিতৃহীন হইয়া পড়ায় সবদিক গুছাইয়া লইতে পারে নাই। তা ছাড়া বাপের একমাত্র পুত্র হওয়ায় ছেলেবেলা হইতে অত্যধিক আদর পাইয়া ব্রাহ্মণের বৃত্তিমূলক কাজকর্মও তেমন করিয়া শেখে নাই। তা যাক, যেজন্য সে এতদূর আসিয়াছে তাহাই বলিতেছি। সম্প্রতি সে মুশ্‌কিলে পড়িয়াছে একটি বিবাহযোগ্যা ভগিনী লইয়া। তার বাপ একটু উদার মতাবলম্বী লোক ছিলেন। মায়েরও মত সেই রূপ। মূর্খ কুলীনে কন্যা পাত্রস্থ করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত নন। তাঁর ইচ্ছা এমন একটি ব্রাহ্মণসন্তানকে জামাই করেন পণ্ডিত বলিয়া যাঁর খ্যাতি আছে—দশ-বিশটা গাঁয়ে নাম করিলে যাকে লোকে একডাকে চিনিতে পারে। তা বয়স একটু বেশি হইলেও তাঁদের কোন আপত্তি নাই। শেখরেশ্বর ঠাকুরের নাম তারা অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছে। তাদের গামের সকলেই প্রায় জানে। তা ছাড়া তাদের এক কুটুম্ব কাছাকাছিই কোন্ এক গ্রামে থাকেন, তিনিও শেখর ঠাকুরের কথা প্রায়ই বলেন। রূপে গুণে, বিদ্যায়, নিষ্ঠায় এবং আর্থিক সঙ্গতিতে এরূপ পাত্র মেলা ভার। কু-লোকে বয়সটা কিছু বাড়াইয়া বলে কিন্তু তাদের সেই কুটুম্বটি বলিয়াছেন, ঠাকুরের বয়স এমন কিছুই না। আজ সে স্বচক্ষেও তা দেখিতেছে। আর সতীনে কন্যাদান? শেখর ঠাকুরের তো মাত্র তিন সংসার, এর কম এরূপ পাত্রের পক্ষে আশা করাই তো অন্যায়।

কুলীনে কন্যা দিতে হইলে তো কম করিয়া দশ-বিশটা সতীনের ঝুঁকি পোহাইতে হইত। আর তার ভগিনীর কথা? নিজের বোন সম্বন্ধে সত্য কথা বলিলেও হয়ত লোকে বিশ্বাস করিবে না। তার বোন নন্দরাণী সত্য-সত্যই নন্দরাণী। রূপে, গুণে আর গৃহকর্মে দশখানি গ্রামে তার জুড়ি মিলিবে না এ কথা শশিকান্ত পৈতা ছুঁইয়া বলিতে পারে। আর স্বভাবের তো কথাই নাই। শেখর ঠাকুরের আপত্তি না থাকিলে সে তাঁকে তাদের গাঁয়ে ধরিয়া লইয়া যাইবে। নিজের চোখে সমস্ত দেখিয়া পাত্রী পছন্দ হইলে তিনি সম্বন্ধ পাকা করিয়া আসিবেন এবং তারপর যত শীঘ্র সম্ভব শুভদিন দেখিয়া সে শুভকর্ম সারিয়া ফেলিবে। শেখর ঠাকুরের কোন ওজর আপত্তি সে শুনিবে না, তাঁকে তার সঙ্গে যাইতেই হইবে। পাত্রী দেখিলে তিনি কোনরকমেই আপত্তি করিতে পারিবেন না, শশিকান্ত এ কথা লিখিয়া দিতে পারে।

শেখরেশ্বরের মন ভিজিয়া উঠিল। বাস্তবিক, এ পোড়া গাঁয়েই শুধু কেহ তাঁহার কদর বুঝিল না, নহিলে কত দূর দূরান্তর হইতে লোকে তাঁর নাম শুনিয়া ছুটিয়া আসে। তা, এ ছোকরাটিকে ফিরাইয়া দেওয়া সমীচীন হইবে না। ছোকরা বেশ চালাক-চতুর, তা ছাড়া যখন ভগিনীব গুণপনা সম্বন্ধে একেবারে লিখিয়া দিতে পর্যন্ত রাজি হইতেছে তখন আর সন্দেহ করিবার কিছু নাই—পাত্রীটি নিশ্চয়ই সৎপাত্রী। আর এ-ও যখন এত আগ্রহ দেখাইতেছে। কিন্তু—

এই 'কিন্তু'টুকুই বড় ভয়ানক। এই 'কিন্তু'রা আর কেহ নয়, শেখর ঠাকুরের তিনটি ব্রাহ্মণী। তিনজনেই অল্পবিস্তর মুখরা। শেখর ঠাকুর যদি এখন হুট্ করিয়া এই আগন্তুককে লইয়া ঘরে গিয়া হাজির হন এবং আগন্তুকের আগমনের উদ্দেশ্য যদি ব্রাহ্মণীদের কানে যায় তবে এই ভর-দুপুরবেলা তাঁর শান্তিময় বাড়িতে দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যাইবে। অথচ ইহাকে ব্যাপারটা ভাল করিয়া না বুঝাইয়া লইয়া যাওয়াই বা যায় কী করিয়া? অবশ্য এক কাজ

করা যাইতে পারে, উহাকে আপাতত জমিদার-বাড়ির অতিথিশালায় লইয়া যাওয়া যায়। কিন্তু বিদেশী লোক, ব্রাহ্মণ সন্তান, তাঁহার নাম শুনিয়া তাঁহারই কাছে আসিয়াছে—কুটুম্বিতার প্রস্তাব লইয়া। ইহাকে বাড়ি না লইয়া গিয়া জমিদারের অতিথিশালায় ঢুকাইয়া দেওয়াটাই বা কী রকম ভদ্রতা হইবে? হয়ত উহার ফলে লোকটি তাঁর প্রতি বিরক্ত হইয়া বিবাহের প্রস্তাবই ফিরাইয়া লইবে। শেখরেশ্বর মহা দ্বিধায় পড়িলেন।

কিন্তু শশিকান্ত লোকটি অদ্ভুত। শেখরেশ্বরের আমতা আমতা ভাব দেখিয়া সে যেন তাঁর মনের কথা টের পাইল, কহিল, 'একটা কথা আমার একটু-আধটু কানে এসেছে। শুনেছি আপনার ব্রাহ্মণীরা কেউই আপনার পুনর্বিবাহের পক্ষপাতী নন। সুতরাং এ রকম একটা নতুন প্রস্তাব নিয়ে আমি গেলে হয়ত তাঁরা খুশি হবেন না। তাই আপনার আপত্তি না থাকলে আর-একটা প্রস্তাব করি।'

শেখরেশ্বর যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। আগ্রহের সঙ্গে বলিলেন, 'হ্যাঁ, তাঁরা কেমন যেন একটু ইয়ে—। তা, কী প্রস্তাব?'

'ধরুন আমি যদি এই বলে পরিচয় দিই যে আমি আপনার শিষ্য হতে এসেছি? আপনার কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন করব,—ব্রাহ্মণের যা কাজ। আপনি ছাত্র হিসাবে আপনার বাড়িতে আমাকে স্থান দেবেন। কেমন? তাতে তো ঠাকরুনরা কোন সন্দেহ করবেন না নিশ্চয়ই? তা ছাড়া তাঁদেরকে খুশি রাখবার ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন।'

চমৎকার! ছোকরার অদ্ভুত বুদ্ধি। শেখরেশ্বর শশিকান্তের উপর ভীষণ খুশি হইয়া উঠিলেন, 'বেশ, বেশ, ভাল কথা। তাহলে আর কোন কথা উঠবে না। আসছে পূর্ণিমার দিন রাধামাধবের মন্দিরে একটা মহোৎসব-গোছের আছে, সেটা চুকে গেলেই রায়-মশাইকে বলে আমি কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে আপনার সঙ্গে

আপনাদের—কী বললেন? সিমলাই!—হ্যাঁ, সিমলাই যেতে পারব। এ কটা দিন ঐ ব্যবস্থাই ভাল।'

'ভাল। কিন্তু আমাকে যেন আর "আপনি" বলবেন না; আমি আপনার শিষ্য হতে এসেছি, "তুমি" বলেই ডাকবেন।'

শেখরেশ্বর থতমত খাইয়া বোকা হাসি হাসিয়া বলিলেন—'হেঁ হেঁ, তা বটেই তো!'

বাড়ি ফিরিয়া শেখরেশ্বর শশিকান্তকে দাওয়ায় বসাইয়া অন্দরে ঢুকিয়া হাঁক দিলেন, 'কোথায় গো, বড়বৌ কোথায় গেলে? মেজবৌ!'

উত্তর দিলেন ছোট বৌ। কহিলেন, 'বাড়ি ঢোকা-মাত্র ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন? সঙ্গে একটি লোক দেখলাম বলে মনে হচ্ছে—কে ঐ মুখপোড়া?'

'ছিঃ, ব্রাহ্মণের ছেলে, ওভাবে কথা বলতে হয় না।' শেখরেশ্বর কাঁচুমাচু মুখে বলিলেন। ততক্ষণে অপর দুই ব্রাহ্মণীও আসিয়া জুটিয়াছেন।

'ব্রাহ্মণের ছেলে, তা এখানে মরতে এয়েছে কেন?'

'আঃ, ছোটবৌ! চুপ কর! অনেক দূর থেকে আমার নাম শুনে এসেছে। আমার শিষ্য হতে চায়।'

এবারে তিন ব্রাহ্মণীই একসঙ্গে হাসিয়া উঠিলেন। 'তোমার কাছে! আর লোক জুটল না ভূ-ভারতে! তা, কী শেখাবে তুমি ওকে?—ব্যাকরণ, না কাব্য, না দর্শন, না স্মৃতি?' আবার হাসির ঝঙ্কারে ঘর ভরিয়া উঠিল।

বাস্তবিক এদিক দিয়া শেখরেশ্বরের নিজেরও একটু ভাবনা ছিল। নামের আগে যতই পণ্ডিত শব্দটি উচ্চারণ করুন না কেন, শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ঐ পূজার মন্ত্রটুকু পর্যন্ত। ছেলেবেলায় কিছুদিন টোলে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু ব্যাকরণের বিভীষিকা এড়াইয়া বেশি দূর আগাইতে পারেন নাই। ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতির ধার দিয়াও কোনদিন যান নাই। তা ছাড়া তাঁরা বংশানুক্রমে জমিদার-বাড়ির পুরোহিত,

অল্প বয়স হইতেই চর্চা যা হইয়াছে পূজা-আর্চা সম্বন্ধেই হইয়াছে। আজ খোঁটা দিবার সময় ব্রাহ্মণীরা সুযোগ লইবেনই তো।

হাসি থামিলে বড় বৌ কহিলেন, 'বলি—অন্য কোন মতলব নেই তো হতভাগার? তোমরা তো ডুবে-ডুবে জল খাও!

শেখর ঠাকুর কী জবাব দিবেন ভাবিতেছেন, উদ্ধার করিল স্বয়ং শশিকান্ত। দমকা হাওয়ায় দরজাটা খুলিয়া গিয়াছিল, শশিকান্ত নিঃসঙ্কোচে আসিয়া ভিতরে ঢুকিল এবং স্তম্ভিত ব্রাহ্মণীদের কিছু বুঝিবার অবসর না দিয়া চট্‌পট্‌ তিনজনের পদধূলি লইয়া মাথায় মুখে ছোঁয়াইল। পুঁটুলি হইতে তিনখানি গরদের শাড়ি ও তিনটি সোনার নথ বাহির করিয়া প্রণামী-স্বরূপ মাটিতে রাখিয়া হাসিমুখে কহিল, 'অনেক দূর থেকে গোস্বামী ঠাকুরের নাম শুনে এসেছি।' উনি আমাকে শিষ্য করে নিতে রাজি হয়েছেন। আপনারা আশীর্বাদ করুন যেন ওঁর যোগ্য শিষ্য হতে পারি।' কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণীরা তিনজনেই ঈষৎ মুখ বাঁকাইয়া হাসিলেন, কিন্তু মুখে কিছু কহিলেন না। ছোকরার বুদ্ধি না থাকুক আক্কেল জিনিসটি যে আছে তা তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন।

গুরুশিষ্য-সংবাদ ১৪

তোফা একটি দিবানিদ্রার পর শেখরেশ্বর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে, ঢেঁকিঘরের পাশে তাল-গাছটার ছায়া ক্রমেই দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া আসিতেছে, দূরে থাকিয়া থাকিয়া গাভীর হাম্বা-রব শোনা যাইতেছে; তাদের ঘরে ফিরিবার সময় হইয়া আসিল।

মেজবৌ ঘরে ঢুকিয়া ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, 'খুব তো নাকে তেল ঢেলে ঘুমোনো হচ্ছে, ওদিকে শিষ্য বেচারা তো সেই কোন্‌ সময় থেকে গুরুর জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে আছে! যাও, উঠে গিয়ে

খুঙ্গিপুঁথি যা আছে খুঁজে-পেতে খুলে নিয়ে বস। বহুদিন তো আর ও-সবের বালাই নেই!'

শেখরেশ্বর আবার এক নতুন ভাবনায় পড়িলেন। এ এক মহা ফ্যাসাদ জুটিয়াছে যা-হোক! ব্রাহ্মণীদের চোখে ধুলা দিবার জন্য না-হয় শশিকান্তকে শিষ্য সাজাইয়াছেন, কিন্তু শশিকান্তের চোখেও তো ধূলা দেওয়া দরকার। অত দূর দেশ হইতে আসিয়া হাজির হইয়াছে তাঁহাকে পণ্ডিত ঠাওরাইয়া। নিজের বোনকে তাঁর হাতে সম্প্রদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে—সেও তো তাঁর পাণ্ডিত্য-খ্যাতির জন্যই! এখন আগে-ভাগেই যদি ধরা পড়িয়া যান তবে সে বড়ই কেলেঙ্কারির কথা হইবে! ব্রাহ্মণীদের দেখাইবার জন্য সকালে বিকালে শশিকান্তর সঙ্গে পুঁথি লইয়া বসিতেই হইবে, আবার পুঁথি খুলিলেই শশিকান্তর কাছে ধরা পড়িয়া যাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। ভাবিতে ভাবিতে শেখরেশ্বর ঘামিয়া উঠিলেন।

কিন্তু বেশিক্ষণ বসিয়া ঘামিবারও উপায় ছিল না। শেখরেশ্বরের মনে পড়িল, ঘরের চালের নিচে মাচায় বহুদিনের পরিত্যক্ত তাঁর ছাত্রজীবনের দু-চারখানি ছেঁড়া পুঁথি হয়ত খুঁজিলে পাওয়া যাইতে পারে। হয়ত মুগ্ধবোধের দু-চারখানি পাতাও মিলিয়া যাইতে পারে।

ছিন্ন মুগ্ধবোধখানি খুলিয়া শেখরেশ্বর বাল্যে অধীত বিদ্যাটুকু একটু ঝালাইয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু নাঃ, উইয়ে ধরা পুঁথির অক্ষরগুলিও যেন তাঁর কাছে অসংখ্য উই বলিয়া মনে হইতে লাগিল—সূত্রগুলির একটিও মনে নাই। সমাস, বিভক্তি আর তদ্ধিত সার বাঁধিয়া যেন তাঁকে মুখ ভ্যাংচাইতে লাগিল।

কিন্তু শেখর ঠাকুরের অদৃষ্ট ভাল, পথের সন্ধান মিলিল তাঁরই ব্রাহ্মণীর কাছে। মেজবৌ স্বামীর মুখের ভাব দেখিয়া কহিলেন, 'আ আমার পোড়াকপাল! বসে-বসে ঢং করা হচ্ছে! ছাত্তর পড়াবেন পণ্ডিত মশাই! আরে, তার চেয়ে ছাত্তরটিকে নিয়ে গুটি-গুটি মন্দিরে যাও। কী করে কোশাকুশি নাড়তে হয়, কী করে.

নাক টিপে চোখ বুজে চাল-কলার ধ্যান করতে হয় সেই সব বুঝিয়ে দাও গে। ওরও আখেরে কাজ দেবে, তোমারও বুকের ধড়ফড়ানি থামবে। নাও, কাপড় চাদর পরে নাও।—বলি কোথায় গেলে ভালমানুষের বাছা?' বলিয়া ব্রাহ্মণী দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন শশিকান্তেরই খোঁজে।

শেখর ঠাকুর যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। বাস্তবিকই, এ কথাটা তো তাঁর আগে মনে আসে নাই! কে বলে স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী?

শশিকান্ত সামনে আসিতেই শেখরেশ্বর কহিলেন, 'ভেবে দেখলাম, সকল শাস্ত্রের বড় হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি। ব্যাকরণ বল, কাব্য বল আর দর্শনই বল—সকলেরই শেষ লক্ষ্য হচ্ছে সেই পরমাত্মার সঙ্গে পরিচয় লাভ। ঈশ্বরের করুণায় সেই পরমাত্মা রাধামাধবের রূপ নিয়ে আমাদের কাছে এসেছেন। তাঁকে সেবা করতে শিখলেই সেই পরমাত্মাকে লাভ করা হবে। তাই আমার শিষ্যকে আমি গোড়া থেকেই সেই পরম শাস্ত্র শেখাব ঠিক করেছি। তুমি তৈরি হয়ে নাও। এখনই আমরা মন্দিরে রওনা হব।'

•

রাধামাধবের মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিয়া চলিয়াছে। জমিদার মৃগাঙ্ক রায়ের স্নেহের দুলাল, জমিদারির ভাবী উত্তরাধিকারী জয়ন্ত দুরন্ত দস্যুদের হাতে বন্দী। কী অবস্থায় সে আছে কিছুই জানা নাই। সারা বারোদীঘি গ্রাম জয়ন্তের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে; কিন্তু রাধামাধবের মন্দিরে সে উৎকণ্ঠার ঢেউ আসিয়া লাগে নাই।

সহস্র ঝাড়ের আলোয় মন্দির ঝলমল করিতেছে। সেই আলোয় রাধামাধব তেমনি অপলক দৃষ্টিতে ভক্তের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু-মৃদু হাসিতেছেন। যে রত্নহারটি লইয়া এত কাণ্ড, ঝাড়ের আলো তারও উপর পড়িয়া হাজার টুকরায় ভাঙিয়া পড়িতেছে। মনে হয়, সেও যেন হাসিতেছে। পূজার আয়োজন তেমনি সাড়ম্বরে সাজানো। অভ্যস্ত চোখেও সামান্য ত্রুটিটুকু ধরা পড়ে না। শেখরেশ্বর শশি-

কান্তকে অদূরে বসিতে বলিয়া আরতির আয়োজন করিতে লাগিলেন।

মন্দিরের জমকালো রূপ দেখিয়া শশিকান্ত অবাক হইয়া গেল। রাধামাধব-মন্দিরের সমারোহের কথা কানাঘুষায় সে-অঞ্চলের সকলের সঙ্গে সেও কিছু-কিছু শুনিয়াছিল, কিন্তু তা যে এমনধারা তা সে ভাবিতে পারে নাই। বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে সে যেন প্রতি মুহূর্তে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িতেছিল।

তার বিমুগ্ধ ভাব সুশ্বেতার চোখ এড়ায় নাই। এই তরুণ নবাগতটির পরিচয় সে আগেই শেখর ঠাকুরের কাছে পাইয়াছে। শেখর ঠাকুর অনুমতি লইয়াই শিষ্যকে মন্দিরে আনিয়াছিলেন—নচেৎ সম্পূর্ণ অপরিচিতকে বিগ্রহের এত কাছে বসিতে দিবার নিয়ম এখানে নাই। তা যাই হোক, লোকটির ভক্তি দেখিয়া সুশ্বেতা খুশিই হইয়াছিল। শেখর ঠাকুরের বয়স হইয়াছে, তা ছাড়া পূজা ব্যাপারে তাঁর চালচলনে আড়ম্বরটাই যেন বেশি করিয়া চোখে পড়ে। এ লোকটিকে দেখিয়া মনে হয় দেবতাকে এ ভালবাসিতে জানে, নহিলে কি এমন তন্ময় হইয়া বিগ্রহের দিকে কেহ চাহিয়া থাকিতে পারে? ভবিষ্যতে বৃদ্ধ শেখর ঠাকুরের আসনে তাঁর এই শিষ্যটিকে কল্পনা করিয়া সুশ্বেতা নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন একটু খুশি হইয়া উঠিল।

আরতি শেষ হইলে মৃগাঙ্ক রায় আসিয়া শশিকান্তের সহিত আলাপ করিলেন। যুবকের বিমুগ্ধ ভাব তাঁহারও দৃষ্টি এড়ায় নাই।

দেখিতে দেখিতে পূর্ণিমা আসিয়া পড়িল। প্রতি পূর্ণিমার দিন মন্দিরে একটি বিশেষ উৎসব হয়। জয়ন্ত নাই বলিয়া তা বন্ধ করিবার কোন হেতু নাই। শেখর ঠাকুর এই উৎসবটুকুর জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন। এটি শেষ হইলেই তিনি দিন-কয়েকের ছুটি লইয়া শশিকান্তর সহিত গোপনে সিমলাই রওনা হইবেন, এই রকম ব্যবস্থা হইয়া আছে।

শশিকান্ত রোজই তাঁহার সহিত মন্দিরে যায়। কয়েক দিনের মধ্যেই সে মন্দিরের কাজকর্ম অনেকটা শিখিয়া ফেলিয়াছে।

শেখরেশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সেও পূজা করে। তা ছাড়া কীর্তনেও সে অভ্যস্ত। ভারি মিষ্টি গলা তার। ফলে মৃগাঙ্ক রায় হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই তার উপর খুশি। এমনকি শেখর ঠাকুরের ব্রাহ্মণী তিনজনও এখন আর তাকে আড়াল হইতে 'মুখপোড়া', 'হতভাগা' প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করা প্রয়োজন মনে করেন না—বরঞ্চ একটু স্নেহের চোখেই দেখেন।

শেখর ঠাকুরের সঙ্গেও তার ইতিমধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে। বাহিরে লোক-দেখানো গুরু-শিষ্য সম্পর্ক হইলেও নিজেদের মধ্যে তাহারা ভাবী শালা-ভগিনীপতির মধুর সম্পর্কটাই পাতাইয়া লইয়াছে। বয়সে যথেষ্ট তফাৎ থাকিলেও শেখর ঠাকুর মাঝে-মাঝে তার সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করেন। শশিকান্তও ইতিমধ্যে ভাবী ভগিনীপতিকে সিদ্ধি খাইতে শিখাইয়াছে। বৈষ্ণবদের মধ্যে সিদ্ধির চলন তেমন নাই—সিদ্ধি বিশেষ করিয়া শৈবদেরই নিত্যসঙ্গী, কিন্তু শশিকান্ত অল্প বয়স হইতেই এ বিদ্যায় পক্ক হইয়াছিল, এখন গুরুকেও সে-বিদ্যায় দীক্ষা দিতে ছাড়িল না।

উৎসবের আগের দিন। ভোর হইতেই মন্দিরে ভক্তের ভিড় পড়িয়া যাইবে। আশপাশের নানা গ্রাম হইতে অনেক লোক আসিবে। রাধামাধবকে এইদিন খুব ভাল করিয়া সাজানো হয়। এদিন তাই শেষ রাত্রে শেখর ঠাকুরকে মন্দিরে গিয়া ঠাকুর সাজাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। পুরোহিত ছাড়া বিগ্রহকে স্পর্শ করিবার অধিকার সকলের নাই।

শেষ রাত্রে শেখর ঠাকুর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। আজ রাত্রে গোপনে সিদ্ধিপানের পরিমাণটা একটু বেশিই হইয়া গিয়াছে। শশিকান্তের হাতের সিদ্ধির সরবৎ বড় চমৎকার। শেখর ঠাকুরের নেশার ঘোরটা যেন তখনও ভাল করিয়া কাটে নাই। হঠাৎ মনে হইল, পেটের ভিতর থাকিয়া থাকিয়া কিসে যেন মোচড় দিতেছে। কেমন যেন একটা অস্বস্তির ভাব! ক্রমেই বাড়িতেছে!

শশিকান্ত আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। শেখরেশ্বর তাহাকে মন্দিরে গিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিতে বলিলেন। তিনি কিছু পরে একটু সুস্থ হইলেই আসিতেছেন।

শশিকান্ত মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ফুরফুরে বাতাস। রাশি-রাশি সুগন্ধ ফুল আনিয়া ইতিমধ্যেই জড় করা হইয়াছে। তার গন্ধে চারিদিক ভরিয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য আয়োজনও তৈরি। সুশ্বেতাও এই অন্ধকারে উঠিয়া চারিদিক তদারক করিতেছে।

'শেখর ঠাকুর কোথায় গেলেন? তিনি এলেন না?'

'আসছেন এখনই। শরীরটা একটু অসুস্থ, তাই আমাকে আগে পাঠালেন। আমি কাজ আরম্ভ করে দি, কেমন?'

সুশ্বেতার সম্মতি জানিয়া শশিকান্ত ঠাকুর সাজাইবার কাজ শুরু করিয়া দিল।

অনেকটা সময় চলিয়া গেল, কিন্তু শেখর ঠাকুরের তবু দেখা নাই। শশিকান্ত মন-প্রাণ ঢালিয়া দিয়া রাধামাধবকে সাজাইতেছে। সুশ্বেতা খানিকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া দেখিল, কিন্তু ধ্যানীর ধ্যান ভঙ্গ করিবার তার ইচ্ছা ছিল না, একটু দাঁড়াইয়া সে অন্য কাজে অন্য দিকে চলিয়া গেল।

যখন ফিরিয়া আসিল তখন ঠাকুর সাজানো হইয়া গিয়াছে। কী চমৎকারই না দেখাইতেছে ঠাকুরকে! ফুল দিয়া সারা অঙ্গ মুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তার মধ্যেও কেমন একটা রুচির পরিচয়—চোখ যেন ফিরাইতে ইচ্ছা করে না।

শুধু একটা খুঁত—রত্নহারটিও ফুলের তলায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে। সুশ্বেতার উহা পছন্দ হইল না। ফুল যতই সুন্দর, পবিত্র, নয়নাভিরাম হউক না কেন, অমন সাত রাজার ধন রত্নহারটিকে তাই বলিয়া অমন ঢাকিয়া রাখিলে চলিবে কেন? ওটি না হইলে যে ঠাকুরকে মোটেই মানায় না! উহার উপর আলো পড়িয়া হাজার টুকরায় ছিটকাইয়া পড়িবে, তবেই না—!

সুশ্বেতা শশিকান্তকে ডাকিতে গেল। কে একজন বলিল, 'ছোট ঠাকুর মশায় নৈবেদ্যের থালা ধুতে সামনের পুকুরে গেছেন, এখনই আসবেন।' কিন্তু সুশ্বেতার তর সহিতেছিল না। বিগ্রহ স্পর্শ করিবার অধিকার তারও আছে, সে নিজেই ফুল সরাইয়া রত্নহারটি বাহির করিয়া দিবে।

কিন্তু একি! রাধামাধবের গলায় তো রত্নহার নাই! কোথায় গেল—কোথায় গেল সে হার! শশিকান্তই বা কোথায়?

কিন্তু খোঁজ মিলিল না। না রত্নহারের, না শশিকান্তের। জমিদারের পাইক মন্দিরের আনাচে কানাচে, এবং শেষে গ্রামের সর্বত্র তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আসিল। রত্নহার বা শশিকান্ত কোনটিরই কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

চাঁদপালের দরবার ১৫

নিমপুকুর গ্রামের আসল নাম মাথা-কাটা। কিন্তু ঐ নামের সঙ্গে একটা আপত্তিকর স্মৃতি জড়িত থাকায় বর্তমান জমিদারের আমলে গ্রামের নাম বদলাইয়া নিমপুকুর রাখা হইয়াছে। তবে বৃদ্ধেরা এখনও নতুন নাম রপ্ত করিতে পারেন নাই, মাঝে মাঝে ভুল করিয়া ফেলেন। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে কিন্তু ঐ মাথা-কাটা নামটাও প্রচলিত ছিল না—তখন লোকে বলিত 'সাধুর চর।' ঐখান দিয়া সে সময় এক মস্ত নদী বহিয়া যাইত, তাতেই চর পড়িয়া গ্রামের সৃষ্টি।

সেই পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের কথাই বলিতেছি। পর্তুগিজ দস্যুর উৎপাত তখন হইতেই বাংলা দেশে শুরু হইয়া গিয়াছে। দিল্লীতে মোগল বাদশাহ রাজত্ব করিতেছেন বটে কিন্তু সুবে বাংলার নানা জায়গায় অরাজকতা চলিতেছে। ছোট ছোট জমিদাররাও শক্তি-সঞ্চয় করিয়া ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছেন। সুবেদারকে তাঁরা

আর বিশেষ আমলে আনিতে চান না। আর এই জমিদারি ও তাহার আনুষঙ্গিক শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য তাঁরা যে পথ বাছিয়া লইয়াছেন তাহাও তেমন নিষ্কলঙ্ক নয়। জমিদারি বৃদ্ধির প্রধান উপায় তখন দস্যুবৃত্তি। বেতনভোগী ডাকাত রাখিয়া, ছলে-বলে-কৌশলে নিরপরাধ পথিকের ধনপ্রাণ হরণ করিয়া এই কার্য সমাধা হইতেছে। জমিদার হয়ত ভাল মানুষটি সাজিয়া বসিয়া আছেন—যেন ভাজা মাছটিও উল্টাইয়া খাইতে জানেন না।

সাধুর চরেও এই রকম এক জমিদারি গড়িয়া উঠিতেছিল। জমিদারের নাম রত্নেশ্বর। নামটি সার্থকনামা করিবার জন্য কোন দুষ্কর্ম করাইতেই তাঁর বাধিত না—আর এ কাজে তাঁর প্রধান সহায় ছিল ভীমপাল নামে জনৈক কৈবর্ত-সন্তান। চেহারায়, আকারে এবং চালচলনে ভীমপাল সত্যি-সত্যিই ছিল ভীমের মত। দোর্দণ্ড-প্রতাপ রত্নেশ্বরের নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইত—কিন্তু সে ব্যবস্থা হইত ভীমপালেরই হাত দিয়া। আশেপাশে সর্বত্র তাহার গুপ্তচর ঘুরিয়া বেড়াইত। কোথায় কোন বণিক জলপথে পণ্য লইয়া চলিয়াছে,—তাকে ডুবাইয়া নৌকা লুট করিতে হইবে, কোথায় কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দল শ্রাদ্ধের দান লইয়া মাঠ পার হইতেছেন,—লাঠির ঘায়ে তাঁদের সেই মাঠেই পুঁতিয়া দানের জিনিস কাড়িয়া লইতে হইবে, কোথায় কোন নববধূ নতুন বিবাহের পর অলঙ্কারপত্র-সমেত পাল্কি চড়িয়া শ্বশুর-বাড়ি চলিয়াছে,—কেমন করিয়া তাকে হত্যা করিয়া সে অলঙ্কারপত্র দখল করিতে হইবে—এসব বিষয়ে ব্যবস্থা করিতে ভীমপালের জুড়ি ছিল না। রত্নেশ্বর অত্যন্ত বদ্‌রাগী লোক ছিলেন, কাহারও উপর বিরক্ত হইলে তাহার মাথা না নিয়া রেহাই দিতেন না। মুখ দিয়া একবার শুধু উচ্চারণ করিতেন, 'মাথা আন!'—প্রায় পরমুহূর্তে ভীমপালের দৌলতে অপরাধীর কাটা মুণ্ড আসিয়া হাজির হইত। বাধা দিবার কেহ ছিল না।

সেই রত্নেশ্বর একবার কী কারণে খোদ ভীমপালের উপরই গেলেন

চটিয়া। সামান্য কারণ, কিন্তু কী দুর্বুদ্ধি হইল, অভ্যাস-মত মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—'মাথা আন।' কিন্তু রত্নেশ্বর ভাবিতে পারেন নাই, তাঁর যা প্রতাপ তার সবটাই এখন ভীমপালের দৌলতে; এবং প্রশ্রয় দিয়া দিয়া আজ এমন অবস্থা হইয়াছে যে তাঁর নিজের লোকেরাও আজ তাঁর চেয়ে ভীমপালকে বেশি ভয় করিতে শিখিয়াছে। শোনা যায় ঐ আদেশই রত্নেশ্বরের শেষ আদেশ। আদেশের সঙ্গে-সঙ্গে ভীমপালের বদলে তাঁর নিজের মাথাই স্কন্ধচ্যুত হইয়া পড়ে এবং সেই হইতে জমিদারি ভীমপালের হাতে চলিয়া আসে। রত্নেশ্বরের নাবালক পুত্র ও বিধবা পত্নীও সেই রাত্রেই কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়।

সেই হইতে 'সাধুর চর' হইল 'মাথা-কাটা'। প্রভুর রক্তে রঞ্জিত-হস্ত ভীমপাল ইহার পর কিছুদিন আরও প্রতাপের সহিত জমিদারি বাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু বেশিদিন সে সুযোগ তার হয় নাই। জমিদারি বৃদ্ধির ব্যাপারেই একদিন নৌকাপথে যাইবার সময় ঝড়ে পড়িয়া সরস্বতীর গর্ভে নৌকা-সমেত তার জমিদারি লীলা শেষ হয়।

ভীমপালের ছেলে ভূপাল, এবং ভূপালেরই ছেলে বর্তমান জমিদার চাঁদপাল। চাঁদপালের আমলেই 'মাথা-কাটা' আবার নাম বদলাইয়া 'নিমপুকুর' হইয়াছে।

চাঁদপাল বয়সে প্রৌঢ়। তামাটে রং, বলিষ্ঠ, রোমশ দেহ—দেখিলে অনেকটা তার পিতামহের কথাই মনে পড়ে। সবচেয়ে লক্ষ্য করিবার জিনিস তার চোখদুটি,—চোখ তো নয়, যেন দুটি আগুনের গোলক! সে চোখের দিকে তাকাইলেই মন যেন কেমন অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠে। চাঁদপাল পিতামহের সদ্গুণগুলির অধিকাংশই পাইয়াছে এবং সম্পত্তিবৃদ্ধির বিভিন্ন পথগুলিও যথারীতি আয়ত্ত করিয়াছে। কিন্তু সে নাকি তিন পুরুষের জমিদার, কাজেই তার আচার-ব্যবহারে কিছুটা আভিজাত্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়—যা ভীমপালের বেলায় থাকা সম্ভব ছিল না।

প্রকাণ্ড দীঘির পাড়ে চাঁদপালের বিরাট অট্টালিকা। দীঘির চারদিক ঘিরিয়া সারি-সারি নিম গাছ—ইহারই জন্য গাঁয়ের নাম নিমপুকুর। গাছের ঘন ছায়া দীঘির ঘন জলকে যেন আরও ঘন করিয়া তুলিয়াছে।

বেলা তখন প্রায় তৃতীয় প্রহর। মাধ্যাহ্নিক বিশ্রামের পর চাঁদপাল তার বৈঠকখানায় আসিয়া বসিয়াছে। এই ঘরটিকে দরবার-গৃহ বলা হয়। বিকালে এখানে বসিয়াই চাঁদপাল লোকজনের সহিত কথাবার্তা-বলে, মন্ত্রণা পরামর্শ ইত্যাদিও এখানেই হয়।

এক-এক করিয়া দর্শনপ্রার্থীরা হাজির হইতে লাগিল। কাহারও খাজনা বাকি পড়িয়াছে, হুজুরের নিকট মার্জনা-ভিক্ষার জন্য আসিয়াছে, কেহ বা সময়-ভিক্ষার জন্য। কিন্তু চাঁদপালের দরবারে উহার কোনটিই সহজপ্রাপ্য নয়। কয়েক জনকে পাইকরাই বাঁধিয়া আনিয়াছে। বলা বাহুল্য ইহাদের কারো ভাগ্যই সুপ্রসন্ন নয়, সকলের উপরই চাবুক ও আজ রাত্রের মত অন্ধকুঠরিতে বাসের হুকুম হইবে ইহা প্রায় জানা কথা। হইলও তাই।

দর্শনার্থীরা বিদায় হইলে ঘরের দরজা ভেজাইয়া দেওয়া হইল, ঘরের অধিবাসীরা আরও ঘনীভূত হইয়া বসিল। ইহারা সকলেই চাঁদপালের মন্ত্রণা-পরিষদের সভ্য: যত রকম দুষ্কর্মের প্রধান সহায়।

একটি একটি করিয়া খবর পরিবেশন শুরু হইল। গত কাল বেদিয়ার চরে দু-খানি বড়-বড় সওদাগার নৌকা লুট করা হইয়াছে—লুটের পরিমাণ নেহাৎ মন্দ হইবে না। সিতারার জঙ্গলে প্রতিবেশী জমিদার তমিজুদ্দিনের কয়েকজন কর্মচারী মহাল হইতে টাকা আদায় করিয়া ফিরিতেছিল, তাদের আক্রমণ করিয়া টাকা কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছে। একজন খুনও হইয়াছে, তবে এ পক্ষের ভুলু সর্দার ছাড়া আর কেউ তেমন জখম হয় নাই। ভুলুকে হয়ত এখন মাস-দুইয়ের জন্য বিশ্রাম দিতে হইবে। সরস্বতীর বুকে কয়েকখানি ভারী বজরা আটকানো হইয়াছিল, কিন্তু উহা নাকি পর্তুগিজদের আশ্রিত, তাই

ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বজরার আরোহী মারফৎ ডি-মেলো সাহেবকে শুভেচ্ছা জানাইতেও ভুল হয় নাই। মৈনুদ্দিন সর্দারের দল সুন্দরবনের কোন এক অঞ্চল হইতে একদল তীর্থযাত্রীকে সপরিবারে বাঁধিয়া আনিয়াছে, হুজুরের হুকুম-মত তাদের ব্যবস্থা করা হইবে। তারা নাকি চন্দনা গাঁয়ের প্রজা।

একমুখ কড়া তামাকের ধোঁয়া উদ্গীরণ করিয়া চাঁদপাল বিরক্ত কণ্ঠে কহিল, 'এসব টোটকা খবর তো রোজই আছে, আর কোন খবর নেই?—ফিরিঙ্গির চক থেকে কোন লোক আসে নি?'

'আজ্ঞে, না তো!"

চাঁদপালের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, 'শেষটায় বারেটোও কি বেইমানি করলে! এত দিন হয়ে গেল, আগাম টাকা দেওয়া হল,—অথচ সেই চুপচাপ! আমার ধারণা ছিল পর্তুগিজরা আর যাই হোক বিশ্বাস ভঙ্গ করে না। কথা দিয়ে কথা রাখতে কসুর করে না।' একটু থামিয়া বলিল, 'ওদিকে সুবেদার সাহেব পেছনে লেগেছেন—তাঁকেও দাওয়াই দেওয়া যাচ্ছে না!'

চাঁদপালের কথা শেষ হইতে না হইতে দরজায় করাঘাত পড়িল। চকিতে পারিষদ দল একটু সরিয়া বসিল।

'কে?'

'আজ্ঞে, আমি বিব্বু।'

'ওঃ! এস ভেতরে এস।'

ঘরে ঢুকিয়া বিব্বু আভূমি নত হইয়া অভিবাদন করিল, তারপর পেছন ফিরিয়া, বোধহয় দুইজন ফিরিঙ্গি সৈনিককে লক্ষ্য করিয়া কহিল, 'তোমরা বাইরে অপেক্ষা কর।' বিব্বুর মুখে প্রসন্নতার হাসি।

'কী খবর, বিব্বু? পাদ্রি সাহেব ভাল আছেন তো?'

'হ্যাঁ, তাঁর কাছ থেকেই আসছি।' বিব্বু সন্তর্পণে পোশাকের ভিতর হইতে কাপড়ে মোড়া একটি বাক্স বাহির করিয়া ইতস্ততভাবে চারিদিকে চাহিল।

'কী আছে ওর মধ্যে ? স্বচ্ছন্দে খুলতে পার।'

এবার আর বিব্ব, দ্বিধা না কবিয়া বাক্সটি খুলিয়া চাঁদপালের হাতে অর্পণ করিল। ঠিক সেই সময়ে জানলা দিয়া পড়ন্ত সূর্যের আলো ঘরের মধ্যে লুকোচুরি খেলিতেছিল। তারই এক টুকরা ছিটকাইয়া আসিয়া সেইখানে পড়িতেই একটা তীব্র আলোকচ্ছটায় ঘরশুদ্ধ লোকের চোখ ধাঁধিয়া উঠিল। সকলে বিস্ময়-বিমুগ্ধ চোখে দেখিল, চাঁদপালের হাতে একটি অপরূপ কণ্ঠাভরণ। পরক্ষণেই একটা অস্ফুট গুঞ্জন শোনা গেল—'রাধামাধবের রত্নহার।'

ফিরিঙ্গি-প্রসঙ্গ

১৬

ইতিপূর্বে আমরা রসরাজকে সপ্তগ্রামে এনায়েৎ খাঁর বাড়িতে চিন্তাকুল অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম। এবার আর-একবার তাঁর খোঁজ নেওয়া যাক।

এনায়েৎ খাঁ ফৌজদারের বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, এব সে সম্বন্ধেই রসবাজের সহিত তাঁহাব কথাবার্তা হইতেছিল।

'তাহলে ফৌজদার নিজে এখন কিছু আশ্বাস দিতে পারছেন না?' রসরাজ নিরাশ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন।

'তাই তো তাঁব কথাব ভাবে বুঝলাম। বেচাবা এখন নিজের তালই সামলাতে পারছেন না। সপ্তগ্রামে এই গোলমাল, তাব ওপব ফিরিঙ্গিবা শাসিয়েছে—বন্দরের একখানা ইটও তারা স্বাভাবিক অবস্থায় রাখবে না। হুগলীতে তাদেব প্রবল প্রতিপত্তি—কেল্লা-ভর্তি বসদ আর সৈন্য। আর সে সৈন্যও ফৌজদারের সৈন্যদেব চাইতে অনেক বেশি শিক্ষিত। রক্তও তাদের গবম—অপমানের পুরোপুরি প্রতিশোধ না নিয়ে নাকি তারা থামবে না।'

'ফৌজদার কী করছেন?'

'কী আর করবেন, যে-কোন মুহূর্তে ফিরিঙ্গিরা আবার হয়ত

একটা বড় রকম আক্রমণ করবে—তারই প্রতীক্ষা করছেন। এবারে হয়ত ওরা জাহাজ-সমেত আসবে, তোপ দাগতেও ছাড়বে না। ফৌজদারের হাতে যা সৈন্য আর গোলা-বারুদ আছে তাতে বাইরে থেকে সাহায্য না পেলে ভাবনার কথা। আশেপাশে, যেখানে নবাবের সৈন্যদের ঘাঁটি আছে,—সর্বত্র খবর পাঠান হয়েছে। সাহায্য যে কোন সময়ে এসে পড়তে পারে।'

রসরাজ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কী ভাবিলেন, তারপর কহিলেন, 'হুঁ, মার ছাড়া আর ওষুধ নেই। শুনেছিলাম গোয়ায় এদের নতুন শাসনকর্তা এসেছে,—ভারি ভাল লোক। ডাকাতি করার চাইতে ব্যবসার দিকে ভাল করে নজর দেবার জন্যই নাকি সে হুকুম দিয়ে রেখেছে। কিন্তু এ পোড়া বাংলা দেশে দেখছি তার উল্টোটাই হচ্ছে। ফিরিঙ্গির সংখ্যাও যেমন দিন-কে-দিন বাড়ছে, নানান জায়গায় তেমনি নতুন-নতুন ঘাঁটিও বসছে। আবার নাকি মগেরাও এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে! এ বিষ এখনই তুলে ফেলতে না পারলে বাদশার রাজত্ব টেকা ভার হবে।'

এনায়েৎ খাঁ সায় দিয়া কহিলেন, 'বাস্তবিকই তাই। তা ছাড়া, শুনেছেন বোধহয়, এই ফিরিঙ্গিরা সব এক জাতের নয়। বাংলাদেশে যারা উৎপাত করছে তারা সব পর্তুগিজ। এখন এদেরই প্রতাপ বেশি। এরা ছাড়া ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি আরও কয়েক জাতের ফিরিঙ্গি আছে। বাংলা মুলুকে না এলেও হিন্দুস্থানের নানা জায়গায় এরা কুঠি বসিয়েছে। শুনেছি সমুদ্রের ধারে ধারে—সুরাটে, মাদ্রাজে এবং আরো কোথায় কোথায় এদের ঘাঁটি রয়েছে। এদেরও পরস্পরের মধ্যে তেমনি সম্প্রীতি নেই।'

রসরাজ একটু যেন আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, 'তাহলে তো এদের একটার পেছনে আর একটাকে লাগিয়ে দিতে পারলেই হয়। নিজেদের মধ্যে খাওয়া-খাওয়ি করে মরুক গে না!'

তাঁর কথার ভঙ্গীতে এনায়েৎ খাঁ না হাসিয়া পারিলেন না।

'খুব সহজ পথ তো বাতলে দিলেন! কিন্তু লাগাবার ব্যবস্থা করে কে? তা ছাড়া যে জাত! যাকে তোয়াজ করবেন সেই হয়ত বুকের ওপর চেপে বসবে!' তারপর গম্ভীরভাবে কহিলেন, 'ঠাট্টা নয়, সত্যি এখন ভাববার সময় এসেছে। আমার মাঝে-মাঝে কী ভয় হয় জানেন? এই যে বিদেশ থেকে নতুন শক্তি একটু একটু করে এ-দেশের মাটিতে ভিত গাড়তে শুরু করল, এ সহজে থামবে না। এখন থেকে সতর্ক না হলে অমন যে বাদশার রাজত্ব তাও হয়ত এর প্রতাপে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙে পড়বে। হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে ঘরোয়া বিবাদ ত্যাগ করে একজোটে এখন এদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো দরকার। কাঁচা অবস্থায় গোড়া ধরে উপড়ে না ফেলতে পারলে শেষে এদের ধ্বংস করা কঠিন হবে। শেষটা এরাই না হিন্দুস্থানের সিংহাসন দখল করে বসে।'

এবার সায় দিবার পালা রসরাজের। 'আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খোঁজ নেওয়া হয়ত মানায় না—কিন্তু তবু মনে হয়, বাদশাহ একটু ভুল করছেন। নানা জায়গায় এদের কুঠি বসাতে দিয়ে, অবাধ বাণিজ্য করবার ফরমান দিয়ে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। এর ফল কী হবে কে জানে! বাংলার সুবেদারও তো শুনলাম এদের সঙ্গে খাতির রাখারই চেষ্টা করছেন।'

এনায়েৎ খাঁ বাধা দিয়া বলিলেন, 'সেটা বোধহয় ঠিক নয়। এখানকার ফৌজদার তেমন কড়া নয় দেখে হয়ত তাই মনে করছেন। ফৌজদার লোকটি একটু দুর্বল প্রকৃতির। আমারই আত্মীয় তো, আমি জানি। এতদিন যিনি সুবেদার ছিলেন তিনিও ছিলেন ঐ রকম, সহজে ওদের ঘাঁটাতে চাইতেন না। কিন্তু সম্প্রতি যিনি নতুন সুবেদার হয়েছেন তাঁর সঙ্গে নাকি ফিরিঙ্গিদের বনিবনাও হচ্ছে না। ইনি অবশ্যি অল্পদিনের জন্যই গদিতে বসেছেন; আগ্রা থেকে বাদশারই কোন আত্মীয় এলে ও পদ ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু যতদূর শুনেছি ফিরিঙ্গিদের ব্যবহারে এই অল্প ক-দিনেই ইনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে

উঠেছেন। ফৌজদারের সঙ্গে আমার সেই কথাই হচ্ছিল।'

'কী কথা?

'ফৌজদার বলছিলেন আমায় একবার জাহাঙ্গিরনগর যেতে। গিয়ে সুবেদারের সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে ফেলতে। তাঁর নিজেরও যাবার দরকার ছিল, কিন্তু সাম্প্রতিক হাঙ্গামায় তাঁর পক্ষে এখন সাতগাঁ ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই সে-সবের কিছু-কিছু ভারও আমার উপর চাপাতে চান। আমিও ভাবছিলাম, রায়মশাইয়ের ব্যাপারটার জন্যই একবার খোদ জাহাঙ্গিরনগর গেলে ভাল হত।'

'কিন্তু সে তো অনেক দূর—ততদিনে এদিকে যে অনেক কিছুই অঘটন ঘটে যেতে পারে।'

'তা ঠিক, কিন্তু এখানে থেকেই বা আমরা কী করছি? আমি বলি কি, আমার বিশ্বস্ত লোক দিয়ে রায় মশাইকে একটা খবর পাঠাই, তারপর চলুন আমি আর আপনি চলে যাই জাহাঙ্গির-নগর—সুবেদারের কাছে। তাঁর সাহায্য ছাড়া এ উৎপাত ঠাণ্ডা করা যাবে বলে মনে হয় না।'

রসরাজকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া এনায়েৎ খাঁ আবার কহিলেন, 'এ ছাড়া আর অন্য পথ নেই। যদি ভাগ্নেকে বাঁচাতে চান, ভগ্নীপতির বিপদ দূর করতে চান তবে এই করতে হবে। এবং দেরি না করে আজ-কালের মধ্যেই রওনা হতে হবে। সময় যতটা লাগবে মনে করছেন তা লাগবে না। সবটা আমরা জলপথে যাব না, যতটা পারি ঘোড়ায় যাব। তা ছাড়া ফৌজদারের ছাড় জোগাড় করে নেব। তা সঙ্গে থাকলে পথে কোন অসুবিধা হবে না—চাইকি, সরকারি ছিপের সাহায্যও পাওয়া যাবে। আর ভাববার কিছু নেই, মন ঠিক করে চলুন বেরিয়ে পড়ি।'

রসরাজ এনায়েৎ খাঁকে ভাল রকমই চিনিতেন। মৃগাঙ্ক রায়ের তিনি কত বড় বন্ধু তাহাও তাঁর অজানা ছিল না। বন্ধুর বিপদে

তিনি যা কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছেন তা হইতে তাঁকে ফেরানো সম্ভব হইবে না। মহামায়ার যদি ইচ্ছা থাকে জয়ন্তের উদ্ধার হইবেই, ফিরিঙ্গি দস্যুরাও টিট হইবে।

পরদিন খুব ভোরেই এনায়েৎ খাঁ রসরাজ ও কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর-সহ রাজধানীর উদ্দেশে রওনা হইয়া গেলেন।

জাহাঙ্গিরনগরে ১৭

এনায়েৎ খাঁ রসরাজকে লইয়া জাহাঙ্গিরনগর পৌঁছিলেন। দীর্ঘ পথ, পৌঁছিতে বেশ কয়েক দিন কাটিয়া গেল। রসরাজ ইহার আগে এ অঞ্চলের আর আসেন নাই ; পথশ্রমে একটু ক্লান্ত হইলেও পূর্ববঙ্গের নানা লোভনীয় খাদ্যে সে ক্লান্তি দূর হইল। বিশেষত পদ্মার ইলিশ, তার বুঝি তুলনা নাই! মাঝে মাঝে চরে নামিয়া এই টাটকা ইলিশের ঝোলের ব্যবস্থা করিতে কিছুটা করিয়া সময় ব্যয় হইল। এনায়েৎ খাঁ অনুযোগ করিতেন, রসরাজও বুঝিতেন পথে অযথা দেরি করা সঙ্গত নয় : আর-একদিনকার ইলিশের লোভেই তো আজিকার এই বিপত্তি! কিন্তু মনকে সংযত করিতে পারিতেন না। এ জিনিস হাতে পাইয়া ছাড়িয়া যাওয়া তাঁর শাস্ত্রে শুধু অনুচিত নয়, ক্ষমার অযোগ্য। এমনকি এক-এক বার তাঁর মনে এমন কথাও উঁকি দিতে লাগিল—ভবিষ্যতে ও ছাই বারোদীঘি ছাড়িয়া এই অঞ্চলে আসিয়া বসবাস করিলে কেমন হয়?

জাহাঙ্গিরনগরে এনায়েৎ খাঁর এক পরিচিত বন্ধু রাজদরবারে উচ্চপদে বহাল হইয়াছিলেন। বুড়িগঙ্গার ধারে তাঁর বিরাট বাড়ি। এনায়েৎ খাঁ সঙ্গীদল-সহ তাঁহারই ওখানে গিয়া উঠিলেন।

গৌড় অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় বাংলার রাজধানী প্রথমে রাজমহলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় উহা আবার ঢাকায় উঠাইয়া আনা হইয়াছে। দিল্লীতে তখন বাদশাহ জাহাঙ্গির

রাজত্ব করিতেছেন। তাঁহারই নামে নূতন রাজধানীর নাম দেওয়া হইয়াছে জাহাঙ্গিরনগর। বাংলার শাসনকর্তা বা সুবেদারের হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় বর্তমানে অস্থায়ী ভাবে সুবেদার হইয়াছেন ইব্রাহিম খাঁ। যতদিন না দিল্লী হইতে বাদশাহের মনোনীত নূতন সুবেদার নিযুক্ত হইতেছেন ততদিন ইনিই কাজ চালাইবেন। তবে শোনা যাইতেছে এবারে নূতন সুবেদার আসিতে কিছু দেরি হইবে। সাধারণত বাদশাহের কোন নিকট-আত্মীয়কেই এই দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হয়। এবারে যাঁহার সম্ভাবনা নিয়োগের তিনি বর্তমানে দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ দমনের কাজে ব্যস্ত আছেন, সুতরাং আপাতত কিছুদিন ইব্রাহিম খাঁই এই পদে বহাল থাকিবেন।

সুবেদারের গদিতে বসিয়া ইব্রাহিম খাঁ দেখিলেন, দেশের প্রায় চারিদিকেই অশান্তি। পূর্বাঞ্চলে মগ ডাকাতের উপদ্রব ক্রমেই বাড়িতেছে, নিম্নবঙ্গে ফিরিঙ্গির উৎপাত। তাঁর পূর্ববর্তী সুবেদার কঠোর হস্তে ইহাদের দমন করিবার চেষ্টা না করিয়া আপোস-আলোচনা করিয়াই ইহাদের থামাইতে গিয়াছিলেন। ফলে ইহারা থামে তো নাই-ই, বরঞ্চ আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিবার সুবিধা পাইয়াছে। তাহার উপর কিছুদিন যাবৎ এক নূতন বিপদ দেখা দিয়াছে স্থানীয় জমিদারদের লইয়া। রাজকর্মচারীদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া ইহারাও মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিতেছেন—নবাবকে আর নবাব বলিয়া মানিতে চান না। অনেকে তাঁদের দেয় রাজস্ব ঠিকমত দিতেছেন না—কেহ-কেহ নানা ওজুহাত দেখাইয়া, কেহ বা একরকম বিনা ওজুহাতেই। ভিতরে ভিতরে হয়ত ইঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার চেষ্টাই করিতেছেন। দুই-একজন জমিদার আবার আরও একধাপ উপরে উঠিয়াছেন। ফিরিঙ্গি বা মগদস্যুদের সঙ্গে একত্র হইয়া তারা নবাবের বিরুদ্ধে লাগিয়াছেন। কর দেওয়া দূরে থাকুক, নবাবের সম্পত্তি লুট করিয়া, নবাবের প্রজা নবাবের ফৌজ আক্রমণ করিয়া—নানা ভাবে তারা রাজশক্তির বিরুদ্ধে উপদ্রব শুরু করিয়াছেন।

ভূতপূর্ব সুবেদার এর কোন প্রতিকারই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ফলে অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

জাহাঙ্গিরনগরের কেল্লার ভিতর সুবেদারের খাস মন্ত্রণাগৃহে সেদিন এইসবেরই আলোচনা চলিতেছিল। ইব্রাহিম খাঁর সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন প্রভাবশালী রাজকর্মচারী। কিন্তু সকলেরই মুখ খুব উদ্বিগ্ন—সকলকেই খুব বিচলিত দেখাইতেছিল।

সম্মুখে আতরদানের পাশে একখানা খোলা চিঠি পড়িয়া। চিঠিখানি আসিয়াছে নিমপুকুর হইতে, প্রেরক আর কেহ নয়,—স্বয়ং চাঁদপাল। কিছুদিন যাবৎ চাঁদপালের সহিত সুবেদারের খুব খিটিমিটি চলিতেছে। রাজসরকারের বহু রাজস্ব বাকি পড়িয়াছে চাঁদপাল কিছুই দেয় নাই—উপরন্তু সুবেদারের লোকদের উপর নানারূপ জুলুম করিতেও ছাড়ে নাই। সেখানকার ফৌজদার সৈন্য প্রেরণ করিলে তাদের সহিত চাঁদপালের অনুচরদের কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধও হইয়া গিয়াছে। তাই সুবেদার এবার কঠোর হস্তে চাঁদপালকে দমনের আয়োজন করিয়াছেন, এবং কয়েকবার তাকে সামান্য নাজেহাল করিতেও ছাড়েন নাই। কিন্তু ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে চাঁদপালের অত্যন্ত অন্তরঙ্গতা থাকায় চেষ্টা সত্ত্বেও তেমন কঠোর কিছু করা সম্ভব হয় নাই। এ বিষয়ে দিল্লীতে বাদশার দরবারে পরামর্শ চাহিয়া সংবাদ পাঠান হইয়াছে, কিন্তু তার কোনও জবাব এখনও পাওয়া যায় নাই।

সম্প্রতি যেন চাঁদপাল নূতন করিয়া নানা প্রতিশোধের আয়োজন করিতেছে এবং নিমপুকুরের আশেপাশে নবাবের খাস প্রজাদের অবস্থা খুবই শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে। প্রায়ই নানাদিক হইতে নানা অত্যাচারের খবর আসিতেছে। লুঠতরাজ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হত্যা—সবই আছে। ফৌজদারের সৈন্য কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

কিন্তু আজ যে চিঠিখানা আসিয়াছে তাহা আরও গুরুতর। চিঠিতে চাঁদপাল সুবেদারকে জানাইয়াছে—নিমপুকুরের আশেপাশে শতাধিক বর্গ ক্রোশ পরিমাণ স্থানে তাহাকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে

হইবে। ঐ অঞ্চলের যে রাজস্ব এতদিন নবাবের রাজকোষে জমা হইত তা এবার হইতে চাঁদপালের নিকট জমা দিতে হইবে। শুধু তাই নয়, ইহা ছাড়া আশেপাশের অঞ্চলে শান্তিরক্ষার জন্য নবাবের রাজকোষ হইতে প্রতি বছর চাঁদপালের সেরেস্তায় পঞ্চাশ হাজার আশরফি (মোহর) শান্তিপণ দিতে হইবে।

ইহার পর চাঁদপাল লিখিয়াছে—আশা করি নবাব সাহেব অতঃপর দেশের শান্তি ও চাঁদপালের সহিত বন্ধুত্বের খাতিরে উপরের সর্তগুলি স্বীকার করিয়া লইবেন, এবং এ বিষয়ে অনাবশ্যক দ্বিধা করিয়া সময়ক্ষেপ করিবেন না। আর নবাব সাহেব যদি ইহাতে গররাজি হন তবে ভবিষ্যতের ফলাফলের জন্য চাঁদপালকে যেন দোষী না করেন।

পরিশিষ্টে চাঁদপাল জানাইয়া দিয়াছে—ঈশ্বরেচ্ছায় এবং তার বন্ধু ফিরিঙ্গি সাধুর অনুগ্রহে আজ সে এমন এক অদ্ভুত গোপন অস্ত্রের অধিকারী যার সাহায্যে সে ইচ্ছা করিলে মহামারী ছড়াইয়া কয়েক দিনের মধ্যে সমগ্র সুবে বাংলা শ্মশান করিয়া দিতে পারে। সুবেদার যেন ভাবিয়া চিন্তিয়া জবাব দেন। আগামী চতুর্দশী তিথি পর্যন্ত চাঁদপাল তাঁহার জবাবের প্রতীক্ষা করিবে ও তাহার পর যথাকর্তব্য স্থির করিবে।

জাহাঙ্গিরনগরে পৌঁছিয়া সকালের দিকটা বিশ্রামেই কাটিল। এনায়েৎ খাঁর বন্ধু, বাড়ির কর্তা কাজী সাহেব রসরাজের জন্য ব্রাহ্মণ পাচক দিয়া আলাদাভাবে বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। মাধ্যাহ্নিক ভোজনটিও বেশ পরিপাটি মতই হইল। আহারের পর কিছুক্ষণ নিদ্রার পর রসরাজ একটু শহর ভ্রমণে বাহির হইলেন। আজই সন্ধ্যার পর সুবেদারের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইবে—কাজি সাহেব এইরূপ ভরসা দিয়াছেন।

নদীর ধারটি বড় সুন্দর। নদীর ধারে প্রশস্ত রাজপথ। একধারে বড় বড় অট্টালিকা। তাহাদের সু-উচ্চ চূড়াগুলি যেন আকাশ ভেদ

করিয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছে। বিরাট ফটক, সুন্দর পুষ্পোদ্যান। রসরাজ বড় শহরের মধ্যে সপ্তগ্রাম দেখিয়াছেন, কিন্তু রাজধানীর দৃশ্য যেন একটু অন্যরূপ। সপ্তগ্রাম বাণিজ্যপ্রধান জায়গা। দোকান-পসরায়, আলোয় সর্বদা ঝকমক করে, পথঘাট সর্বদা লোকের ভিড়ে গম্‌-গম্‌ করে। নানা দেশবিদেশের লোকের ভিড় সেখানে। কিন্তু এখানকার দৃশ্যে কেমন একটি গাম্ভীর্য আছে—যা নাকি শুধু রাজ-ধানীতেই মানায়। ঘুরিতে ঘুরিতে রসরাজ নদীর ধার হইতে অনেক দূরে চলিয়া আসিলেন।

অদূরে এক জায়গায় একটি ছোটখাট ভিড় জমিয়াছিল। উৎসুক পথচারীরা সকলেই সেইদিকে ছুটিয়া জনতাটিকে ক্রমেই বড় করিয়া তুলিল। খানিকক্ষণ ইতস্তত করিয়া শেষে কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া রসরাজও সেইদিকে আগাইয়া গেলেন।

ঘটনা-প্রবাহ ১৮

রসরাজ ভিড় লক্ষ্য করিয়া আগাইয়া গেলেন। একটি বৈরাগী দুহাতে দুটি মাটির হাঁড়ি লইয়া বাজাইতেছে ও সেইসঙ্গে গ্রাম্য সুরে গান গাহিয়া চলিয়াছে, তাহাকে ঘিরিয়াই ভিড়। বৈরাগীর গলা নেহাৎ মন্দ নয়। সে গাহিতেছিল :

হায়রে বিধি, দুনিয়ার এ কী হইল হাল!
—এ কী হাল রে!
সোনার দ্যাশের মধু এখন 'বল্লায়,'[1] চুইসা খায়,
দমকা হাওয়ায় ময়ূরপঙ্খী ডুবল দরিয়ায়।
রাজা ঘুমায়, মন্ত্রী ঘুমায়, ঘুমায় কোতোয়াল,
দ্যাবপুরে অসুর ঢুইক্যা ইন্দ্রে কইল ঘাল।
হায়রে বিধি, দুনিয়ার এ কী হইল হাল!
—এ কী হাল রে!

(১) বোল্‌তায়

খালে বিলে নাইক পানি—খা-খা করে মাঠ,
চাষার সম্বল ক্ষ্যাতের মাটি ফাইটা হইল কাঠ।
দিনদুপুরে শিয়াল চরে, বেড়ায় ফেরুপাল,
নিষ্কলুষ পথিকের রক্তে বেবাক হইল লাল।
হায়রে বিধি, দুনিয়ার এ কী হইল হাল!
—এ কী হাল রে!
সাত সমুদ্দুর ডিঙ্গি মাইরা কাবা আইল দ্যাশে,
রাইয়ত 'পরজার'[২] ধনদৌলত দেয় পাহারা কে সে?
বারোদাঘির বারো ঘাটে ঢুকল পঙ্গপাল,
সরস্বতীর ঘোলা জলে কুম্ভীর কাটে খাল।
হায়রে বিধি, দুনিয়ার এ কী হইল হাল!
—এ কী হাল রে!

বৈরাগীর গান থামিলে যেমন অল্প সময়ে ভিড় জমিয়াছিল, তেমনি অল্প সময়েই তা ভাঙিয়া গেল। বৈরাগীর সম্মুখের মাটিতে বিছানো কাঁথাখানি ইতিমধ্যেই ছোট-বড় নানা রকম মুদ্রায় ভরিয়া উঠিয়াছে। ভিড় সরিয়া গেলে রসরাজ ধীরে ধীরে বৈরাগীর আরও কাছে আসিলেন। আংরাখা হইতে একটি রৌপ্যমুদ্রা তাহার কাথায় ফেলিয়া দিতেই বৈরাগীর দৃষ্টি তাঁর দিকে আকৃষ্ট হইল। রসরাজও স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাইয়াছিলেন; তিনিই প্রথম কথা কহিলেন—

'এ গান কোথায় শিখলে? তুমি কি এদিককার লোক?'

'কেন বলুন তো?'—বৈরাগী এদিক-ওদিক চাহিয়া হাসিয়া উত্তর দিল। এবার আর তার স্বরে প্রাদেশিক টানের আভাস পাওয়া গেল না।

'না, এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম। তোমার গানে বারোদীঘি, সাতগাঁ—এ সবের উল্লেখ রয়েছে কিনা।—সে তো আর এ অঞ্চলে নয়!'

(২) প্রজার

'তাতে কী ? এক জায়গায় কেউ গান বাঁধলে তা কি আর অন্য জায়গায় মুখে-মুখে ছড়াতে পারে না ?'—বৈরাগী তেমনই হাসিয়া কহিল।

রসরাজ একটু অপ্রস্তুত হইলেন, কথার মোড় ফিরাইয়া বলিলেন, 'খাসা গলা কিন্তু তোমার। চর্চা রেখো।'

'আজ্ঞে, না রেখে উপায় কী ?—এই তো আমার পেশা।'

নাঃ, বৈরাগী বড় পট্-পট্ জবাব দেয়। রসরাজ আবার অপ্রস্তুত বোধ করিলেন। দুই পা সরিয়া আসিয়া হঠাৎ খেয়াল হইল, বাড়ি হইতে অনেকটা চলিয়া আসিয়াছেন, রাস্তা মনে পড়িতেছে না। কাছাকাছি আর কাহাকেও না পাইয়া বৈরাগীর কাছেই আবার ফিরিয়া আসিতে হইল,—'আচ্ছা মতি-মঞ্জিলটা কোন্ দিকে বলতে পার—সুখনবাগের মতি-মঞ্জিল ? সুখনবাগ কোন্ পথ দিয়ে যেতে হবে ?'

এবার কিন্তু বৈরাগী চট্‌পট্ জবাব দিতে পারিল না। একটু আমতা আমতা করিয়া কহিল, 'আজ্ঞে—বোধহয়—আচ্ছা ঐ মুদির দোকানে খোঁজ নিচ্ছি।'

এবার হাসিবার পালা রসরাজের। বলিলেন, 'অর্থাৎ তুমি এ অঞ্চলের লোক নও। তবে বল, এসব খবর কোথায় পেলে—ঐ যে গানের ভিতর বলছিলে ? ও যে বড় টাটকা খবর হে !'

বৈরাগী যেন একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, প্রশ্ন তার কানে পৌঁছিল কি না বুঝা গেল না। রসরাজের পাশে হাঁটিতে হাঁটিতে সে আগাইয়া চলিল। একটু ভিড়ের মধ্যে পৌঁছিয়া চুপি-চুপি বলিল, 'এখানে কিছু সুবিধে হবে মনে হয় না। আজ নবাবের সঙ্গে দেখা করুন, কিন্তু কালই বারোদীঘি ফিরে যান—গোলমাল আরও পেকে উঠেছে।' রসরাজ ফিরিয়া দেখেন, বৈরাগী ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

সেইদিনই রাত্রে রসরাজ ও এনায়েৎ খাঁ কাজি সাহেবকে সঙ্গে

লইয়া সুবেদার ইব্রাহিম খাঁর সহিত কেল্লায় গিয়া দেখা করিলেন। ইব্রাহিম খাঁ মনোযোগ দিয়া সমস্ত শুনিলেন, সপ্তগ্রামের সমস্ত খবর খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ফৌজদারের প্রতি সহানুভূতি জানাইলেন, ফিরিঙ্গিদের মনের সুখে গালি পাড়িলেন কিন্তু আসল ব্যাপারে তেমন কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারিলেন না। তাঁর সৈন্য-সংখ্যা উপযুক্ত পরিমাণ নাই, তার উপর সুবে বাংলায় সর্বত্রই এই এক কাহিনী। বিশেষত চাঁদপালের হুমকি তাঁকে বাস্তবিকই বিচলিত করিয়াছিল। চাঁদপালের অসাধ্য যে কিছুই নাই—এবং সত্য-সত্যই প্রস্তুত না হইয়া বাজে কথায় ধাপ্পা দিয়া কাজ হাসিল করিবার মত লোক যে সে নয় তাহাও তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। বর্তমানে তাঁর মাথায় শুধু সেই চিন্তাই ঘুরিতেছিল। চাঁদপালের সর্তে সায় দেওয়া যেমন অসম্ভব—তেমনি তাহার সহিত আঁটিয়া উঠিবার জন্য প্রস্তুত হওয়াও কম কঠিন নয়। এখন এদিকে নজর না দিয়া নানা দিকে দৃষ্টি দিতে গেলে শেষ পর্যন্ত কোনটাতেই সফল হওয়া যাইবে না। তবে হ্যাঁ, সপ্তগ্রাম রক্ষার জন্য সাধ্যমত ফৌজের ব্যবস্থা তিনি অবশ্যই করিবেন—কিন্তু মৃগাঙ্ক রায়ের পুত্রের জন্য কতদূর কী করিতে পারিবেন কথা দিতে পারেন না। অবশ্য সম্ভব হইলে চেষ্টা করিবেন।

ক্ষুণ্নমনে রসরাজ ও এনায়েৎ খাঁ কেল্লা হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

চতুর্দশীর পূর্বেই চাঁদপালের নিকট নবাবের বার্তা পৌঁছিল। চাঁদপালের সর্ত যেমন অসম্ভব, রাজপ্রতিনিধির পক্ষে তা মানিয়া লওয়া তেমন আরও অসম্ভব। চাঁদপাল যেন এখনও ভালয় ভালয় নিরস্ত হয়—নচেৎ—? মোগল সাম্রাজ্য তো এখনও ভাঙিয়া পড়ে নাই,—বাদশাহ এ ব্যাপার কিছুতেই বরদাস্ত করিবেন না। এখনও নিরস্ত হইলে সুবেদার কিছু বলিবেন না, কিন্তু পরে হয়ত চাঁদপালের ভাগ্যে সে সুযোগ জুটিবে না এবং এর বিষময় ফল তাহাকে ভোগ করিতে হইবে।

চাঁদপালের তরফ হইতে ইহার কোন জবাব আসিল না, কিন্তু ইহার পরেই শুরু হইল কয়েকটি অবিশ্বাস্য ঘটনা। প্রথম ঘটনাটি ঘটিল নিমপুকুর হইতে বিশ ক্রোশ দূরে বাঁশপোতা গ্রামে। প্রশস্ত নদীর ধারে এই গ্রামটির স্বাস্থ্যকর বলিয়া বরাবরই বেশ সুনাম ছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন এই গ্রামে এক অদ্ভুত রোগের আবির্ভাব হইল। সুস্থ মানুষ—দিব্যি হাটিয়া চলিয়া বেড়াইতেছে, হঠাৎ কাঁপিতে কাঁপিতে সে বসিয়া পড়িল—সমস্ত শরীর থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে, মাথা ঝিম্-ঝিম্ করিতেছে, এমনকি কথা বলিবার পর্যন্ত শক্তি নাই। দু-দণ্ডের মধ্যে সমস্ত শরীর লাল হইয়া বড় বড় ফোস্কা পড়িতে শুরু করিল। তারপর বৈদ্য ডাকিবার পূর্বেই সব শেষ। এরকম একটি নয়—ঘরে-ঘরে এই রোগ।

তিন দিন যাইতে-না-যাইতে শোনা গেল পদ্মার তীরে খড়ুই গ্রামেও ঠিক ঐ রকম রোগ দেখা দিয়াছে। বাঁশপোতা হইতে এই গ্রাম বহু দূর—সাত-আট দিনের পথ। কিন্তু রোগের লক্ষণ এবং সমাপ্তি ঠিক এক রকম। তারপর দুই সপ্তাহের মধ্যে আরও প্রায় সাত-আটটি গ্রামে এই রোগ ছড়াইয়া পড়িল। কোন প্রতিকার নাই—হেকিম-কবিরাজরা এই অদ্ভুত রোগের কোন কিনারাই করিতে পারিলেন না—কোন ওষুধেরও তাই ব্যবস্থা হইল না। সমস্ত দেশ জুড়িয়া এক প্রবল আতঙ্কের ছায়া নামিয়া আসিল।

কয়েকদিন পরে শোনা গেল—যে গ্রামে এই রোগ দেখা দেয় তাহার ঠিক আগেই সেখানে চাঁদপালের কোন বিশ্বস্ত কর্মচারীর আবির্ভাব হয়।—তা সে নিমপুকুর হইতে যত দূরেই হোক না কেন। আর সেই কর্মচারীটি চলিয়া গেলেই শুরু হয় রোগের প্রাদুর্ভাব। কর্মচারীটি একা আসে না—সঙ্গে সশস্ত্র সিপাহি এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তাহারা ঘোরা-ফেরা করে—নিরীহ গ্রামবাসীদের পক্ষে তাই পূর্বাহ্ণেই তাদের ঠেকানো সম্ভব হয় না।

যথা সময়ে সুবেদার ইব্রাহিম খাঁর কানেও এ সংবাদ পৌঁছিল।

চাঁদপাল নিজেই তাঁকে এ সংবাদ জানাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

ফিরিঙ্গির দোস্ত ১৯

ফিরিঙ্গির চকে দিনের আলো ধীরে ধীরে মিলাইয়া আসিতেছে। জঙ্গলের ভিতর দিয়া সরু পায়ে-চলা পথ, দুপাশে বড়-বড় গাছ—তাদের ঘনসন্নিবিষ্ট ডালপালা পথটিকে আরও অন্ধকার করিয়া তুলিয়াছে। দূরে আবছা অন্ধকারে পর্তুগিজ দুর্গের সুউচ্চ প্রাচীর ঘুমন্ত দৈত্যের মত অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

পথ নির্জন। শুধু ঝাউগাছের ফাঁকে ফাঁকে বাতাস ঢুকিয়া একটা সোঁ সোঁ শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে। দূরে ঝিঁঝি পোকার একটানা সুর, এবং ক্বচিৎ শুকনা ঝরা পাতার উপর কাঠবিড়ালি বা ঐ জাতীয় কোন প্রাণীর ছুটিয়া যাওয়ার খস্-খস্ আওয়াজ।

সেই পথ দিয়া মন্থর গমনে চলিয়াছে একজন ফকির। গায়ে ঢিলা আলখাল্লা, তার ভাঁজে-ভাঁজে ময়লা জমিয়া কালো কালো রেখার সৃষ্টি করিয়াছে। গলায় কয়েকগাছা ছোট-বড় নানা আকারের নানা রঙের মালা, মাথায় ময়লা পাগড়ি এলোমেলো ভাবে জড়ানো। ফকিরকে কিন্তু বেশ প্রফুল্লই মনে হইতেছিল। কাঁচা-পাকা দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে গুন্-গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে সে হাঁটিয়া চলিয়াছিল।

দুর্গের কাছাকাছি পৌঁছিয়া ফকির হঠাৎ থামিয়া গেল ; খানিকক্ষণ আপন মনে কি ভাবিয়া লইল, তারপর দুর্গের প্রধান ফটকের দিকে না আগাইয়া জঙ্গল ভাঙিয়া দুর্গের পূর্বদিকে অগ্রসর হইল।

দুর্গের দক্ষিণে ও পশ্চিমে ভাগীরথী তার বিশাল জলরাশি লইয়া সমুদ্রের উদ্দেশে বহিয়া চলিয়াছে। নদী এখানে এত চওড়া যে এপার ওপার সহসা চোখে ঠাহর হয় না। দুর্গের উত্তর ও পূর্বদিক

ঘিরিয়া প্রশস্ত পরিখা, তাহাও নদীর জলে কানায় কানায় ভর্তি—বাহির হইতে নৌকার সাহায্যে বা সাঁতার না কাটিয়া দুর্গপ্রাচীরে পৌঁছান যায় না। উত্তর দিকে দুর্গের প্রধান ফটক। আলগা সেতু দিয়া ফটকে পৌঁছান যায়, আবার দরকার হইলে কপিকলের সাহায্যে সেতু তুলিয়া রাখা চলে।

ফকির পরিখার ধার দিয়া দিয়া দুর্গের পূর্বদিকটা প্রায় প্রদক্ষিণ করিয়া ফেলিল। চারিদিকে সুকঠিন মসৃণ প্রাচীর খাড়া উঠিয়া গিয়াছে। অস্পষ্ট অন্ধকারেও তার দুর্ভেদ্যতা সম্বন্ধে আন্দাজ করিতে কোন কষ্ট হয় না। হাঁটিতে হাঁটিতে ফকির দক্ষিণ-পূব কোণে একেবারে গঙ্গার ধারে গিয়া হাজির হইল। এখানেও দুর্গের মসৃণ দেয়াল জল হইতে খাড়া উপরে উঠিয়া গিয়াছে। অনেক উঁচুতে কয়েকটি ছোট-ছোট ঘুলঘুলি হইতে ক্ষীণ আলোক-রেখা আসিয়া গঙ্গার চঞ্চল স্রোতে পড়িয়া কাঁপিতেছে। ইহা ছাড়া সমস্ত দুর্গটি যেন একটি মূর্তিমান রহস্য—কোথাও জীবনের চিহ্ন নাই। ফকির খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, তারপর ঘুরিয়া বিপরীত দিকে অগ্রসর হইল।

সন্ধ্যার অন্ধকার আরও একটু গাঢ় হইলে ফকির ধীরে ধীরে দুর্গের প্রধান ফটকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ফটকের ঠিক মুখেই বন্দুক হাতে একজন প্রহরী, বোধহয় অন্য কিছু করিবার না থাকায়, বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিল। ফকির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকে দেখিয়া লইয়া আরো কাছে আগাইয়া আসিল।

'সেলাম আদ্‌মিরাল্ সাহেব, মেজাজ শরীফ?'

প্রহরী চমকাইয়া উঠিয়া বিদ্যুৎবেগে বন্দুক আঁকড়াইয়া ধরিল। চোখে তলোয়ারের ধার হানিয়া উগ্র কণ্ঠে হাঁকিল—'কে? তফাত যাও!'

কিন্তু ফকিরের দূরে যাইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, হাসিমুখে প্রহরীর একেবারে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর তেমনি স্মিত হাস্যে সেলাম জানাইয়া কহিল, 'আমি, আদ্‌মিরাল সাহেব! আপনাদের দোস্ত্।'

'দোস্ত্ !'—ফিরিঙ্গি প্রহরী সন্দেহাকুল চোখে ফকিরকে খুঁটিয়া দেখিতে লাগিল। দুর্গ-তোরণে ঝুলানো বড় ঝাড়-লণ্ঠন হইতে এক ঝলক আলো এবার ফকিরের ঠিক মুখের উপর পড়িয়াছিল। কিন্তু কই, দেখেছি বলে মনে পড়ে না তো।'

'আরে, আপনার কি মনে থাকতে পারে! আমি একটা সামান্য ফকির, পথে-ঘাটে খোদার নাম নিয়ে বেড়াই। ভারি তো লোক আমি! কিন্তু আদ্‌মিরাল, আপনাকে আমি অনেকবার দেখেছি। বন্ধুক হাতে লড়াইয়ের সময় আপনার সেই বীর মূর্তি—সে কি সহজে ভুলবার? তাছাড়া কে না জানে এই কেল্লার আপনি একজন মুরুব্বি লোক? নইলে যে-সে লোক কি এই ফটকের জিম্মায় থাকতে পারে আদ্‌মিরাল্?'

বার বার 'অ্যাড্‌মিরাল' অর্থাৎ সেনাপতি সম্বোধনে ফিরিঙ্গি প্রহরী মনে মনে খুশি হইল। এ লোকটা একেবারেই উজবুক সন্দেহ নাই, নহিলে দুর্গের পাহারাদারকে অ্যাড্‌মিরাল বলিয়া ভুল করে! কী দরকার ইহার কাছে সত্য কথা বলিয়া ভুল সংশোধন করিয়া দিবার! বোকা মানুষের বোকা বানাইয়া যদি একটু খাতির পাওয়া যায় দোষ কী তাহাতে?

ফকির তখনও বলিয়া চলিয়াছে—ভাগ্যিস আপনারা, পর্তুগিজরা, এ দেশে সময় মত এসে গেছেন, তাই বোধহয় দেশটা বেঁচে গেল। নইলে দেশের যা হাল হয়েছিল! দু'দিন বাদে আপনারাই হবেন এ দেশের রাজা, মালিক—এ আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।' আর একটু ঢোক গিলিয়া কহিল, 'আর বলতে কি, বুড়ো হতে চলেছি, নইলে আমিও আপনাদের একজন হয়ে যেতাম।'

ফিরিঙ্গি প্রহরী এবারে কথা বলিল। পাদ্রির ভঙ্গীতে বিজ্ঞের মত কণ্ঠে কহিল, 'তাতে কী, যা সত্যি তার আশ্রয় সব সময়েই নেওয়া যায়। তার জন্য বয়স লাগে না। অনন্ত নরক থেকে একমাত্র আমাদের প্রভুই রক্ষা করতে পারেন। আর সব বিলকুল ঝুঁটা।

আচ্ছা, তোমাকে আমি দিনের বেলা পাদ্রি বারেটো সাহেবের কাছে নিয়ে যাব। রাত্রে তো কারও কেল্লায় ঢুকবার হুকুম নেই। তা তুমি এখানে কোথায় এসেছিলে ?'

'কোথায় আর ! ফকির মানুষ, পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াই, আমাদের কি চাল-চুলো আছে ? যেখানে পাই খাই, যেখানে হয় রাত কাটিয়ে দিই। সকালে এসেছিলাম ভাটিয়ার চরে। একটু ওষুধ-বিষুধ জানা আছে, খোদা মেহেরবানি করে দিয়েছেন। এর-ওর একটু উপকার হয়। তারপর এ বেলা হাঁটতে হাঁটতে এই আপনাদের এখানে এসে পৌঁছেছি। তা এ জায়গাটাকে বুঝি বলে ফিরিঙ্গির চক ? খাসা জায়গা ! আর আপনাদের এই কেল্লা, মালা ছুঁয়ে বলছি, এমন আর কোথাও দেখি নি। এ কেবল, আদমিরাল, আপনাদের জাতের হাতেই হয়। কী পেল্লায় ব্যাপার, বাবাঃ।'

প্রহরীর মুখে এবার আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটিয়া উঠিল। মৃদু হাসিয়া কহিল, 'তবু তো শুধু বাইরেটা দেখেছ, ভেতর দেখলে'—

'খুব জমকালো বুঝি ?'—ফকিরের চোখে-মুখে অকৃত্রিম বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। 'ভিতরে বুঝি খুব বড় বড় ঘর আছে—সব পাথরের, অ্যাঁ ? আচ্ছা, মাটির তলায় নাকি এক সুড়ঙ্গ আছে—হুগলী পর্যন্ত চলে গেছে ?'

বোকাটার সামনে একটু বড়াই করিবার ইচ্ছা প্রহরীকে ক্রমেই পাইয়া বসিতেছিল, কিন্তু ভিতরের কথা বাহিরের লোককে, তা সে দোস্তই হোক আর যেই হোক, বলা ঠিক হইবে কি না ভাবিয়া সে ইতস্তত করিতে লাগিল। ফকির এবার ধীরে ধীরে আলখাল্লার ভিতর হইতে ছোট একটি গেঁজিয়া বাহির করিল। তারপর তার ভিতর হইতে সযত্নে কি খানিকটা বাহির করিয়া মুখের ভিতর ফেলিয়া দিল। তারপর তাহারই খানিকটা প্রহরীর সামনে ধরিয়া কহিল, 'জর্দা-টর্দা খাবার অভ্যাস হয়েছে নিশ্চয়ই—এ মুল্লুকে যখন আছেন ? এ খোদ্ কাশীর জর্দা,—বহুত খোসবাই।' প্রহরী একটু কিন্তু

কিস্তু করিয়া শেষে খানিকটা জর্দা লইয়া মুখে ফেলিয়া দিল।

'পান—এক খিলি? আদমিরাল? খুব মিঠা পান,—বাহারি মশলাদার।'—ফকির গেঁজিয়া হইতে পান বাহির করিয়া আগাইয়া দিল, নিজেও একটা মুখে ফেলিতে ত্রুটি করিল না। কিন্তু তার আপ্যায়ন তখনও শেষ হয় নাই। অতঃপর একটা তুলিতে সামান্য আতর মাখাইয়া আদ্‌মিরালের সামনে ধরিয়া কহিল,—'গোঁফে মাখিয়ে. কানে দিয়ে রাখুন।'

এবারে ফিরিঙ্গি প্রহরীর মুখে হাসি ফুটিল। মনে মনে ভাবিল, লোকটা বোকা হইলেও দিল্‌-খোলা সন্দেহ নাই।

'বেয়াদবি মাফ করবেন, আমরা ফকির মানুষ—একটু ধোঁয়া-টোঁয়াও টানা পছন্দ করি। ঠাণ্ডার মুখে বেশ লাগে।' ফকির একটি ছোট কলিকা লইয়া আগুন জ্বালাইল, তারপর কৌশলে দুই হাত একত্র করিয়া একটি টান দিয়া তৃপ্তির সঙ্গে ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিল—'এ জিনিসের কিন্তু তুলনা নেই! আপনাদের সাগরপারে শুনেছি অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস জন্মায়—কিন্তু এ জিনিস এই বাংলা মুলুক ছাড়া কোথাও পাচ্ছেন না।'

প্রহরীর দৃষ্টি আবার লোলুপ হইয়া উঠিয়াছিল—'তা, তা, ও জিনিস যে চাখি নি তা নয়, তবে বেশি কড়া আবার সহ্য হবে কি?'

'কিছু না, কিছু না। ঠাণ্ডার মুখে খাসা লাগবে। দিন, আপনাকে ভাল জিনিস দিই।' ফকির গাঁজার কলিকায় নতুন করিয়া মশলা পুরিয়া আগাইয়া দিল, ভাল করিয়া টানিবার কৌশলও দেখাইয়া দিল। কয়েকবার কাসিয়া প্রহরী অবলীলাক্রমে ধূম উদ্গীরণ করিয়া চলিল। জিনিসটা তার তেমন অপরিচিত বলিয়া মনে হইল না। ক্রমে তার মুখটিও ভিজিয়া আসিল—তা তাদের পরবর্তী কথাবার্তা হইতেই বুঝা যায়।

'আচ্ছা, এ কেল্লাটা তো দোতলা নয়? ঘরের ওপর ঘর?' ফকির জিজ্ঞাসা করিল।

দোতলা? ফোঃ, কী যে তোমাদের ধারণা! চারতলা। এক-—দুই—তিন—চার। আবার তার ওপর টাওয়ার আছে। সেখানে উঠে চারদিকে কয়েক ক্রোশ অবধি সব কিছু দেখা যায়। তা ছাড়া মাটির তলায়ও আছে একটা তলা।'

'মাটির তলায় একটা তলা! বলেন কী! তাজ্জব ব্যাপার! সেখানে বুঝি হাঁস মুরগি রাখা হয়?'

'দূর বোকা,' ফিরিঙ্গি ফকিরের মূর্খতা দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। 'সেখানে রাখা হয় সব কয়েদীদের। যাদের বন্দী করে আনা হয় নানা জায়গা থেকে।'

'ও! তা মাটির তলা তো হল গঙ্গারও নিচে। নদীর জল ঢুকে পড়ে না ঘরে?'

'আরে, না রে, না। কেল্লার ভিতটা তো নদীর চাইতে অনেকটা উঁচু কিনা, তাই কেল্লার যে ঘর রয়েছে মাটির নিচে—আসলে তা নদীর খানিকটা উপরেই রয়েছে। অবশ্যি বেশি ওপরে নয়।'

'জানলা খুললেই বুঝি নিচে নদীর জল চোখে পড়ে?'

ফিরিঙ্গি আরেক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিল, 'দূর, জানলা কোত্থেকে আসবে! কয়েদীদের ঘর শুনছ না? জানলা বসিয়ে তাদের পালাবার পথ করে দেয় কেউ? তবে, ভেতরের দিকে হাওয়া ঢুকবার কয়েকটা গর্ত আছে বটে।'

'আর আলো?'

'আলো! কয়েদীদের জন্য আবার আলো! আর মাটির তলায় কোত্থেকে আলো আসবে, এক মশাল বা লণ্ঠনের আলো ছাড়া? তবে হ্যাঁ, নদীর দিকে একটা গুপ্ত দরজা রাখা হয় সময়-অসময়ে বিপদ-আপদের জন্য। তা, সে দেয়ালের সঙ্গে এমনি ভাবে সাঁটা যে না জানা থাকলে কারও বাপের সাধ্যি নেই তা খুঁজে বার করতে পারে।'

'ভারি অদ্ভুত তো! আচ্ছা আদ্‌মিরাল, আপনাদের এখানে দেশ ছেড়ে এসে কষ্ট হয় না? কেল্লায় আর কত লোকই বা আছেন?

গল্পগুজব—একটু ফুর্তি-টুর্তি, এর তো কিছুই উপায় নেই।'

'কেন থাকবে না? কী তুমি মনে কর আমাদের! এ কি তোমাদের দেশী হাঁড়িমুখোর দল পেয়েছ? কাজের সময় কাজ, ফুর্তির সময়ে ফুর্তি। সন্ধ্যার কিছু পরেই কেল্লার বড় ঘরে সব জড় হবে—তারপর রাত দুপুর অবধি চলবে খাওয়াদাওয়া—ফুর্তি, হৈ-হল্লা। সময়-সময় স্বয়ং পাদ্রি বারেটোও এসে তাতে যোগ দেন। আমাদের দেশের মদ—সে তো চাখো নি কোনদিন! আচ্ছা, তুমি তো দোস্ত হলে, খাওয়াব একদিন তোমায়।'

'তা সবাই ফুর্তি করলে কেল্লা দেখাশোনা করে কে?'

'কয়েকজনের ওপর ভার থাকে পাহারা দেবার। এই যেমন আজ আমি ফটকে বসেছি। তেমনি ভেতরে-ভেতরেও পাহারা দেবার লোক আছে। তাদের জায়গা ছেড়ে যাবার নিয়ম নেই।'

'সেই নদীর ধারে পাতালকুঠুরি পর্যন্ত বরাবর পাহারা থাকে? কম লোক লাগে না তো!'

'কেবল বড়-বড় জায়গাগুলোতে থাকে; তাই বলে কি আর গলিঘুঁজিতে লোক দরকার হয়? এই ধর না, এই ফটকের বাঁ-দিকের গলি দিয়ে ঢুকলেই একেবারে কেল্লার দক্ষিণ-পুব কোণায় যে চোরা-কুঠুরি আছে সেখানে গিয়ে হাজির হওয়া যায়। তাই বলে কি সেখানে পাহারার দরকার হয়? অত সরু গলি—কে আর তার কথা জানতে আসবে বল?'

'তা তো বটেই। আচ্ছা আদ্‌মিরাল, আপনাদের দেশের গল্প বলুন না! সেখানেও কি এত বড়-বড় নদী আছে?'

ফিরিঙ্গির নেশা বেশ জমিয়া আসিতেছিল, দেশের কথায় সে খুব উত্তেজিত হইয়া পড়িল। 'কী যে বল! আমাদের সে সমুদ্রের দেশ। জলেই তো আমরা মানুষ! নদীকে আমরা থোড়াই গ্রাহ্য করি!' তারপর সে অনর্গল স্বদেশের গল্প নানা রং চড়াইয়া বলিয়া যাইতে লাগিল।

ফিরিঙ্গি একটু দম নিবার জন্য থামিলে ফকির বলিল, 'আর-এক ছিলিম হবে নাকি? না, এবার বোধহয় ফটক তুলতে হবে? সময় হয়ে এল বোধহয়?'

ফিরিঙ্গি তাচ্ছীল্যের সহিত কহিল, 'দেবে? দাও আর-এক ছিলিম। চাঁদনি রাত আছে, একটু দেরি হলেও এসে যাবে না, গল্পটা শেষ করে নি।'

ফকির গেঁজিয়া হইতে আর-একবার 'মশলা' বাহির করিল। কিন্তু এবারকার ছিলিমটি যেন একটু বেশি কড়া—দুই-এক টান দিবার পরই ফিরিঙ্গির কথা কেমন জড়াইয়া আসিতে লাগিল; দুই-একবার হাই তুলিয়া সে একটু আড় হইয়া শুইল। গল্পের স্রোত আগের মত পূর্ণ বেগে আর বহিয়া চলিতে পারিল না, ভাটার টান লাগিয়াছে যেন তাতে। একটু পরেই দেখা গেল ফিরিঙ্গি গভীর নিদ্রায় ঢলিয়া পড়িয়াছে।

ফকির আর সময় নষ্ট না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অতি সন্তর্পণে ফিরিঙ্গির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তার নাক, বুক ইত্যাদি পরীক্ষা করিল। না, ঘুম বেশ গভীর হইয়াছে। ওষুধের ক্রিয়া শুরু হইয়াছে তবে। এ ঘুম ভোরের আগে ভাঙিবার কোন সম্ভাবনা নাই। ফকির ঈষৎ হাসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, 'ঘুমোও আদ্‌মিরাল,—থুড়ি দোস্ত, আরাম করে ঘুমোও। আবার বন্দুক নিয়ে কষ্ট করা কেন? ওটা এখন আমার জিম্মায় থাক, কেমন?' ঘুমন্ত প্রহরীর হাতের মুঠি হইতে বন্দুকটি খুলিয়া লইতে বিশেষ কষ্ট হইল না। বন্দুকটি আকারে ছোটখাট, কিন্তু বেশ মজবুত। ও জিনিস এ দেশে তখনও আমদানি হয় নাই। ফকির বন্দুকটি সন্তর্পণে নিজের বিরাট ঢোলা আলখাল্লার মধ্যে পুরিয়া দিল—এবং সহজেই সেটি সেখানে বেমালুম ঢুকিয়া গেল।

তখন ফকির এদিক-ওদিক চাহিয়া গম্ভীর মুখে ফটকের ভিতর দিয়া দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

দুর্গের ভিতর ঢুকিয়া ফকির পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইল। সম্মুখে কেহ নাই, কিছু দূরে একটা তীব্র আলোকরেখা দেখা যাইতেছে; হয়ত ঐ দিকেই দুর্গের বাসিন্দারা ভিড় করিয়াছে। ফকির সন্তর্পণে একটু আগাইয়া বাঁয়ে ঘুরিল এবং একটি সরু গলি দেখিয়া তাহারই ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। দুর্গের ফিরিঙ্গি প্রহরী বলিয়াছিল, বাঁ-দিকের একটি গলি দিয়া ঢুকিলে একেবারে কেল্লার দক্ষিণ-পুব কোণের চোরা-কুঠ্‌রিতে গিয়া হাজির হওয়া যায়। নিশ্চয়ই এইটিই সেই গলি।

স্যাঁৎসেঁতে গলি। দু-পাশে শক্ত পাথরের মসৃণ দেওয়াল—খাড়া উঠিয়া গিয়াছে; অন্ধকারে গলিটিকে সুড়ঙ্গ বলিয়াই ভ্রম হয়। মাঝে-মাঝে দেয়ালে ছোট-ছোট খুপরি কাটিয়া সেখানে তেলের প্রদীপ বসাইয়া পথটিকে অল্প আলোকিত রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু সে আলো এত দূরে-দূরে এবং এতই ক্ষীণ যে খানিকক্ষণ আগাইয়া না গেলে চোখে ঠাহর করা যায় না। ফকির ঝুলির মধ্য হইতে দুটি চকমকি পাথর বাহির করিয়া মাঝে মাঝে তাহা ঘসিয়া তাহারই চকিত-আলোকে দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইল।

পথও পাথর দিয়া বাঁধানো, কিন্তু তা দেয়ালের মত অত মসৃণ নয়। খালি পায়ে হাঁটিতে ফকিরের বেশ কষ্ট হইতেছিল। মাঝে-মাঝে জল গড়াইয়া গলিটি স্থানে স্থানে পিছল হইয়া আছে। সম্ভবত দেয়ালের অপর পাশের কোন ঘর হইতে নালার জল এই পথেই বাহির করিয়া দিবার আয়োজন হইয়াছে। ফকির কয়েকবার পড়িতে পড়িতে কোন রকমে দেয়াল ধরিয়া আত্মরক্ষা করিল।

আরও খানিকটা যাইতে দেখা গেল গলিটি আর-একটি চওড়া রাস্তার সহিত মিশিয়াছে। এবং, কয়েকটি ভারী পায়ের শব্দ সেই রাস্তা বাহিয়া ক্রমেই নিকটে আসিতেছে। মুহূর্তের জন্য ফকিরের বুক দুরু-দুরু করিয়া উঠিল। পরক্ষণেই আলখাল্লার ভিতর হইতে

সন্থ-সংগৃহীত বন্দুকটি টানিয়া বাহির করিয়া সে শক্ত করিয়া ধরিল। বন্দুকটিতে গুলি ভরাই আছে। পিঠ টান করিয়া অন্ধকার দেয়ালের গায়ে ফকির নিজের শরীরটাকে প্রায় মিশাইয়া দিল।

পায়ের শব্দ আরও নিকটে আসিল। তিনজন পর্তুগিজ শান্ত্রী দুর্বোধ্য ভাষায় গল্প করিতে করিতে আসিতেছে। নিজেদের গল্পেই তারা মাতোয়ারা। একজন বোধহয় কি একটা হাসির কথা বলিল, তিনজনই অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। কঠিন পাথরের গায়ে ঠেকিয়া সে হাসি ফিরিয়া আসিল প্রতিধ্বনিরূপে। শান্ত্রীরা ফাকরকে লক্ষ্য করিল না—তেমনই হাসিতে হাসিতে অতিক্রম করিয়া গেল।

শব্দ দূরে মিলাইয়া গেলে ফকির স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া আগাইয়া আসিল। বন্দুকটিকে এবার সে আর আলখাল্লার ভিতর পুরিল না, হাতের মুঠির ভিতরই ধরিয়া চলিতে লাগিল। প্রহরী বলিয়াছিল, গলি দিয়া সোজা গেলে চোরা-কুঠরিতে পৌছানো যায়। সুতরাং ফকির গলি ছাড়িল না। রাস্তা পার হইয়া গলি আবার সামনে চলিয়া গিয়াছে, যদিও পথটি এবার বেশ আঁকাবাঁকা। চলিতে চলিতে ফকির হঠাৎ এক জায়গায় হোঁচট খাইল। কোন রকমে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া দেখে, সেখানটায় একটা মস্ত গর্ত। পাশের দেয়াল খানিকটা ভাঙিয়া একটা লম্বা গহ্বরের মত সৃষ্টি করিয়াছে, গর্তটি বরাবর সেইদিকে চলিয়া গিয়াছে। এখানটায় আলো নাই—ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। তা ছাড়া জল ও প্যাচপেচে কাদা জমিয়া জায়গাটিকে মানুষের প্রায় অগম্য করিয়া রাখিয়াছে। নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ফকির মনে মনে ভাবিল, ভালই হইল, তেমন প্রয়োজন হইলে আত্মগোপন করিবার একটা জায়গার সন্ধান পাওয়া গেল। এখানে লুকাইলে চট্ করিয়া খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভব হইবে না।

ফকির এবার খুব সাবধানে অগ্রসর হইল। আরও খানিকক্ষণ চলিবার পর দেখা গেল, গলিটি একটি প্রশস্ত সিঁড়ির উপর আসিয়া শেষ হইয়াছে। সিঁড়ি নিচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। ফকির

ক্ষণেক দ্বিধা করিয়া শেষে সিঁড়ি দিয়া নামিতে শুরু করিল।

এবার কানে অস্পষ্ট জলকল্লোল ভাসিয়া আসিতেছে। গঙ্গায় জোয়ার আসিয়াছে বোধহয়। নদী খুব কাছেই। চোরা-কুঠুরির দেখাও হয়ত এখনই মিলিবে।

সত্যই তাই। আর কয়েক পা যাইতেই একটি প্রশস্ত বারান্দা, এবং তাহারই অপর দিকে ভারী লোহার দরজা—ঘরটি যে বন্দীশালা, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ সাক্ষ্য দিতেছে। মাথার উপর একটি বড় ঝুলানো লণ্ঠন হইতে আলো আসিয়া জায়গাটাকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে।

সেই আলোকে ফকির আরও দেখিল, দরজার মুখে দু-জন প্রহরী —একজন ফিরিঙ্গি, অপরজন সম্ভবত মগ, গভীর মনোযোগের সঙ্গে মাটিতে দশ-পঁচিশ, কি ঐ ধরনের কোন খেলায় মগ্ন।

ফকির থমকিয়া দাঁড়াইল, তারপর একটু আড়াল হইতে উভয়কে লক্ষ্য করিতে লাগিল।

প্রহরীদের মধ্যে বোধহয় গুটির চাল লইয়া কোন মতভেদ হইয়াছিল; উভয়েই বেশ উত্তেজিত কণ্ঠে পরস্পরের কথার প্রতিবাদ করিতেছে। এবং সে প্রতিবাদ ক্রমেই ধাপে ধাপে বচসার পথে চলিয়াছে,—হাতাহাতিই বাধে বুঝি বা! একটু পরে দুজনেই উপুড় হইয়া গুটি লইয়া কাড়াকাড়ি শুরু করিল, এবং উভয়ে উভয়ের এত কাছে আসিয়া পড়িল যে পরস্পরের মাথা পায় ঠোকাঠুকি লাগিবার জোগাড়।

ফকির আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করিল না। এমন সুযোগ আর হয়ত আসিবে না। বিদ্যুৎবেগে বন্দুক ঘুরাইয়া সে সজোরে দুই বলিষ্ঠ হাতে বন্দুকের নল চাপিয়া ধরিল, তারপর সেই বন্দুকের কুঁদা দিয়া উভয়ের মস্তক লক্ষ্য করিয়া প্রাণপণে আঘাত করিল। অব্যর্থ লক্ষ্য। প্রহরীদ্বয় কিছু বুঝিবার পূর্বেই অতর্কিত আঘাতে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। মুখ দিয়া একটি শব্দ পর্যন্ত বাহির

হইল না; কোমরের সযত্নবদ্ধ তলোয়ার, পাশের সযত্নে রক্ষিত আগ্নেয়াস্ত্র কোনই কাজে আসিল না।

ফকির একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। তারপর এক এক করিয়া প্রহরীদ্বয়ের সংজ্ঞাহীন দেহ তুলিয়া পিছনে, গলির সেই অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে রাখিয়া আসিল। বন্দুকগুলিও লুকাইতে ভুলিল না।

এইবার চোরা-কুঠুরির লোহার দরজার দিকে তার নজর পড়িল। কিন্তু আশ্চর্য, দরজায় কোন তালা নাই, কী ভাবে বন্ধ করা হইয়াছে তাহাও বুঝা যায় না। ফকির অসহিষ্ণুভাবে সমস্ত দরজা পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তারপর হতাশ ভাবে সজোরে দরজায় ঠেলা দিল। ঠেলা দিতেই কিন্তু দরজা আপনি খুলিয়া গেল। ফকির আর-একবার পিছনে তাকাইয়া লইয়া চকিতে ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। পরমুহূর্তেই তার পিছনে লোহার কপাট আপনা হইতেই আবার সজোরে বন্ধ হইয়া গেল।

ঘরে ঢুকিয়া স্বল্প আলোকে খানিকক্ষণ কিছুই দেখা গেল না। তারপর চোখে অন্ধকারটা সহিয়া গেলে ফকিরের দৃষ্টি পড়িল ঘরের অপর কোণে। দেয়ালের ধারে খড়ের গাদা বিছানো, তাহারই উপর একখানা কম্বল পাতিয়া একটি কিশোর দেয়ালে হেলান দিয়া বিরস বদনে বসিয়া আছে। ছেলেটির দীর্ঘ চুল উস্কোখুস্কো, গায়ের চামড়া রুক্ষ, মুখে একটা গভীর হতাশাময় বেদনার ছাপ। ফকিরকে দেখিয়া ছেলেটি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল, মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। ফকির ধীরে ধীরে আগাইয়া গিয়া তার পাশে বসিয়া পড়িল।

'তোমার নাম জয়ন্ত, না?' মোটা গলায় ফকির প্রশ্ন করিল।

'হ্যাঁ। কিন্তু কী করে জানলেন? আপনাকে তো দেখি নি কখনও!' জয়ন্ত অবাক হইয়া কহিল। 'আপনাকেও বুঝি এরা ধরে এনেছে? উঃ, কী ভয়ঙ্কর লোক এরা!'

ফকির বলিল, 'ঠিক ধরে আনে নি। কিন্তু ধরতই যদি, পালাবার উপায় বার করতে হত তো! তোমার কথা তোমাদের গাঁয়ের আশে-পাশে কে না শুনেছে? তোমার বাবা বড্ড অধীর হয়ে পড়েছেন। কিন্তু কী করবেন কিছুই ঠিক করতে পারছেন না! তা, তোমায় বড্ড কষ্ট দিচ্ছে বুঝি এরা?'

জয়ন্ত কথা বলিল না, ঘাড় কাত করিয়া সায় দিল।

'তুমি নিজে পালাবার চেষ্টা--' কথার মাঝখানে ফকির সহসা থমকিয়া গেল। এতক্ষণ পরে তার চোখে পড়িল, ঘরে শুধু তারা দুই-জনই নাই আরও একটি তৃতীয় লোক ঘরের অপর কোণে কম্বল-মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে। মুখে আঙুল চাপিয়া সেদিকে ইসারা করিয়া ফকির প্রশ্নসূচক নেত্রে জয়ন্তের দিকে চাহিল।

জয়ন্ত ম্লান হাসিয়া কহিল, 'ওঁর কথা বলছেন? উনি আর কতক্ষণ! যে অত্যাচার করেছে ফিরিঙ্গি দস্যুরা ওঁর ওপর, আজ রাতই বোধহয় ওঁর শেষ রাত। দুদিন অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন, প্রবল জ্বর। শুধু প্রাণটুকু এখনও ধুক্-ধুক্ করছে।' একটু থামিয়া কহিল, 'লোকটা বড় ভাল ছিল।'

'কে, চেন নাকি?'

'না, কোন্ পাড়া-গাঁ থেকে লোভ দেখিয়ে ধরে এনেছিল। এদের অসাধ্য তো কিছুই নেই।'

ফকির উঠিয়া এবার লোকটির কাছে গেল। লোকটির বয়স হইয়াছে, মুখে ফকিরেরই মত কাঁচা-পাকা একগাল দাড়ি, রুক্ষ চুল, কিন্তু গড়ন বেশ মোটাসোটা। পরনে ঢিলা আলখাল্লা, লোকটি সম্ভবত মুসলমান। ফকির তার শিয়রের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিল, তারপর খানিকক্ষণ ধরিয়া তাকে পরীক্ষা করিল। জয়ন্ত কাছে থাকিলে দেখিতে পাইত, পরীক্ষা করিতে করিতে ফকিরের সারা শরীর বারেকের জন্য শিহরিয়া উঠিল। একটু পরে ফকির ফিরিয়া আসিল।

'কেমন দেখলেন ?' জয়ন্ত প্রশ্ন করিল।

ফকির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে। বেচারা!'

খানিকক্ষণ কাহারও মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। একটা থমথমে ভাব চোরা-কুঠুরির ভারী বাতাসকে যেন আরও ভারী করিয়া তুলিল। একটু পরে জয়ন্তই কথা কহিল, 'রাত কত হল? এখনই তো বোধহয় খাবার নিয়ে আসবে। খাবার অবশ্যি নামেই খাবার,—আসলে তা পশুরও অখাদ্য। কিন্তু কথা তা নয়। আপনাকে এখানে দেখলে—'

ফকিরেরও চমক ভাঙিল, কহিল, 'হ্যাঁ, তা তো বটেই। গা-ঢাকা তো দিতেই হবে। দেখি—' বলিয়া সে দরজার কাছে গিয়া দরজায় টান দিল। কিন্তু লোহার কপাট একচুলও নড়িল না,—যেন কেহ দেয়ালের সঙ্গে পেরেক দিয়া গাঁথিয়া দিয়াছে। দরজা এমন কৌশলে তৈরি যে ভিতর হইতে টানিয়া খোলা অসম্ভব।

এই নতুন বিপত্তিতে ক্ষণকালের জন্য তাহার বাকাস্ফূর্তি হইল না। এখন কী করা যায়! সহসা মনে হইল, দরজার বাহিরে যেন ভারী পায়ের শব্দ আসিয়া থামিয়া গেল এবং সেইসঙ্গে দু-জন লোকের অস্পষ্ট কথাও কানে আসিতে লাগিল— 'নাঃ, ম্যানেলিস আর সায়ুকে নিয়ে পারা যায় না! আজও দেখ, দরজা ফেলে কোথায় গেছে! দুটোতে বসে রাতদিন জুয়ো খেলবে আর মারামারি করবে। আদ্‌মিরালকে বলে এর একটা বিহিত আজই করতে হবে।' তার সঙ্গী কহিল, 'ঠিকই তো! সেদিনও ঠিক এমনি ভাবেই দরজা ফেলে রেখে বাবুরা গেছলেন ডি'মেলোর কাছে সালিসি মানতে। আরে সে বেটা নিজেই আস্ত মাতাল, মদ নিয়েই ডুবে আছে! সে আবার সালিসি করবে কী! তুমি আজই আদ্‌মিরালের কাছে নালিশ কর, নয়ত খোদ বারেটোর কাছে। বড় আস্কারা পেয়ে গেছে!'

'যাই, কয়েদী দুটোকে খাবার দিয়ে আসি। একটা তো বোধ-

হয় আজই নিকেশ হবে।'

আর এক মুহূর্ত দেরি নয়, ফকির কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। ইঙ্গিত করিতেই জয়ন্ত উঠিয়া দাঁড়াইল। ফকির খড়ের গাদাগুলি একটু সরাইয়া সেখানে টান-টান হইয়া শুইয়া পড়িল, এবং জয়ন্তকে তাহারই গায়ের উপর কম্বল বিছাইয়া শুইয়া পড়িতে বলিল। কম্বলের উপরে জয়ন্ত, নিচে খড়ের জায়গায় ফকির ; অস্পষ্ট আলোয় ফিরিঙ্গির চোখে নিশ্চয়ই ধরা পড়িবে না।

পরমুহূর্তেই ঘরের দরজা ঠেলিয়া একটি ষণ্ডা-গোছের লোক ভিতরে ঢুকিল। তার এক হাতে একটি পিতলের সরায় খানিকটা আধ-পোড়া রুটি, অপর হাতে এক বালতি জল। ঘরের কোণে রক্ষিত জয়ন্তের জন্য নির্দিষ্ট পাত্রে তারই খানিকটা ঢালিয়া দিয়া সে বিরক্ত মুখে অপর বন্দীর কাছে আগাইয়া গেল। 'কী রে, টিকে আছিস তো?'—বলিয়া সে তার কম্বল ধরিয়া টান দিল। একবার ঝুঁকিয়া পরীক্ষা করিল, তারপর কহিল, 'ওঃ, হয়ে গেছে! বেশ, বেশ। থাক আর একটু শুয়ে। আজ শেষ রাত্রেই মুক্তি পাবে বাপধন! ভয় কী?' নিজেরই অভদ্র রসিকতায় সে হাসিয়া উঠিল।

লোকটা তারপর দরজার কাছে গিয়া মুখ বাড়াইয়া সঙ্গীকে হাঁক দিল। ডাক শুনিয়া সেও ঘরে ঢুকিয়া মৃত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিল ; তারপর কহিল, 'আর দেখছ কী, চল এবার আদ্‌মিরাল সাহেবের কাছে। খবরটা দিয়ে দড়ি-টড়ি নিয়ে আসি গে চল। যত তাড়াতাড়ি ল্যাঠা চুকোনো যায় ততই ভাল। বেশি রাত করে নিজেদেরই ঘুম নষ্ট করা ছাড়া আর তো কিছু হবে না!'

ফিরিঙ্গিদ্বয় প্রস্থান করিলে ফকির বাহির হইয়া আসিল। তার দৃষ্টি এবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কি একটা পথের সন্ধান যেন পাইয়া গিয়াছে সে। জয়ন্তকে ঠেলিয়া স্বভাবসিদ্ধ মোটা গলায় সে কহিল, 'এ বেচারি তো গেলই, এই সুযোগে আমাদেরও যাওয়ার

আয়োজন করতে হবে। আমি যা বলছি করতে পারবে তো? কাজটা কঠিন, এবং ঠিকমত করতে না পারলে—ধরা পড়লে মৃত্যু হয়ত অনিবার্য। কিন্তু এ ছাড়া আর পথ দেখছি না। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেই হবে। নইলে হয়ত আর কোনদিনই তা পাওয়া যাবে না। ভাল কথা, তুমি সাঁতার জান তো ভাই?'

তারপর ফকির ধীরে ধীরে জয়ন্তকে নিজের সঙ্কল্প জানাইল।

প্রস্তুত হইতে বেশি দেরি হইল না। মৃত ব্যক্তির ঢিলা আলখাল্লা খুলিয়া ফকির তা নিজের পরিধেয়ের উপর পরিধান করিল। তার পর তাকে টানিয়া আনিয়া জয়ন্তের পরিত্যক্ত শয্যায় কম্বল দিয়া এমনভাবে ঢাকিয়া দিল যে হঠাৎ দেখিলে মনে হয় জয়ন্তই বুঝি আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে। তারপর নিজে মৃত ব্যক্তির শয্যায় ঠিক তাহারই মত করিয়া শুইয়া জয়ন্তকে বলিল, 'তুমি এস, আমার আলখাল্লার ভিতরে ঢোক। তারপর আমার কোমর শক্ত করে আঁকড়ে ধর। খবরদার, যখন ওরা আসবে তখন যেন একটুও আলগা না হয়! লোকটি মোটাসোটা ছিল, ঢোলা আলখাল্লায় তোমায় নিয়েও আমাকে তেমন বিসদৃশ দেখাবে না। তা ছাড়া তোমার গায়ে আমার পুঁটুলির এইসব কাপড় জড়িয়ে দিচ্ছি, গায়ে হাত দিলেও টের পাবে না। খোদার ইচ্ছায় আমাদের দু-জনেরই মুখে এক রকম দাড়ি। অন্ধকারে সন্দেহ করবার কারণ নেই। তা ছাড়া আমার এ ঘরে আসবার সম্ভাবনাও কেউ কল্পনা করতে পারবে না। যে প্রহরীদুটোকে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মেরে অজ্ঞান করে রেখে এসেছি তাদেরকেও কেউ খুঁজে পাবে না। আর নিজেরাও তারা আসবে না—কারণ আজ রাতের মত জ্ঞান ফিরে আসার কোন সম্ভাবনাই তাদের নেই। আর একটা কথা, ওরা এলে জোরে নিশ্বাস নিও না। স্বাভাবিক নিশ্বাসের শব্দ বাইরের নদীর জলের শব্দে চাপা পড়ে যাবে।'

জয়ন্ত কম্পিত দেহে ফকিরের আদেশ পালন করিল। তারপর

তুজনে ঐ ভাবে কম্বল চাপা দিয়া অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ফিরিঙ্গিরা বাস্তবিকই বেশি দেরি করিল না। অল্প পরেই আর তুই-তিনটি সঙ্গী ও দড়ি-সহ ফিরিয়া আসিল। একজন কহিল, 'ম্যানেলিস আর সায়ু বুঝি এখনও ফেরে নি? আচ্ছা, কাল ভোরেই দেখা যাবে!'

মৃত বন্দী মনে করিয়া তাহারা ফকিরের পা ও মাথা দড়ি দিয়া বাঁধিল। ঘাড়ে কাপড় জড়ানো ছিল, তা সত্ত্বেও বাঁধন পড়ায় ফকিরের দমবন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম করিতেছিল, বহু কষ্টে সে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিল। আর কতক্ষণই বা! বাঁধন শেষ করিয়া একজন জয়ন্তের শয্যার দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, 'ও ছোকরা বুঝি আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে আরামে ঘুমুচ্ছে! আচ্ছা, তোমারও বেশি দেরি নেই। তোমাকেও শিগগিরই তোমাদের মা গঙ্গার কোলে ভাসাচ্ছি।'

এইবার একজন গিয়া দরজার পাশে খানিকক্ষণ কি নাড়াচাড়া করিল, সঙ্গে সঙ্গে মসৃণ পাথরের দেয়াল ভেদ করিয়া ভোজবাজির মত নদীর দিকে একটি গুপ্তদ্বার বাহির হইয়া পড়িল। ফটকের প্রহরী ফকিরকে এই গুপ্তদ্বারের গল্পই করিয়াছিল। এই দরজার কয়েক হাত নিচেই খরস্রোতা গঙ্গা বহিয়া চলিয়াছে।

সকলে ধরাধরি করিয়া জয়ন্ত-সমেত ফকিরকে সেই গুপ্তদ্বার দিয়া নদীর ভিতর ফেলিয়া দিল। ঝপাং করিয়া একটা শব্দ হইল। এক ঝলক জল ছিটকাইয়া আসিয়া ঘরের ভিতর খানিকটা জায়গা ভিজাইয়া দিল। তারপর সব চুপ।

দত্তজা ও চৌধুরী-সংবাদ ২১

গঙ্গার জলস্রোতে পড়িয়াই ফকির জয়ন্তকে মুক্ত করিয়া দিল।

তারপর পা দিয়া জল কাটিতে কাটিতে কৌশলে নিজের বাঁধন খুলিয়া ফেলিতেও তার বেশি বেগ পাইতে হইল না। হাত তো খোলাই ছিল, তা ছাড়া অত্যন্ত পাকা সাঁতারু সে। জয়ন্তও সাঁতারে কম পটু নয়। স্রোতের টানে গা ভাসাইয়া দিয়া অল্পক্ষণ পরেই তুজনে তীরে গিয়া উঠিল।

খানিকটা শাদা বালি, এখানে-ওখানে কয়েকটা কাঁটা-ঝোপ, তার-পরই বড় বড় ঝাউগাছের ঘন অরণ্য। কাছাকাছি লোকালয় আছে বলিয়া মনে হইল না।

সেই ভিজা বালির উপর উভয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিল। দীর্ঘ দিনের অত্যাচারে জয়ন্তের শরীর এমনিতেই তুর্বল তার উপর সাম্প্রতিক অভাবনীয় ঘটনার উত্তেজনায় তখনও সে থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল—কী করিয়া যে সে এই তুঃসাহসিক পরীক্ষা পার হইয়া আসিল তা যেন সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না।

আরও খানিক্ষণ কাটিলে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ফকির মোটা গলায় প্রশ্ন করিল, 'এখন শরীরটা একটু ভাল লাগছে? এবারে হাঁটতে পারবে তো ভাই?'

জয়ন্ত উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, 'দেখি, বোধহয় পারব।' কিন্তু এখন কোন্ দিকে যাবেন?'

'যেতে হবে তো অনেক দূর। তোমাকে বারোদীঘিতে তোমার বাবার কাছে পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারছি কই! কিন্তু এখনই তো আর সেদিকে রওনা হতে পারবে না। তাছাড়া, এখন নাহয় ফিরিঙ্গিরা ব্যাপারটা ধরতে পারে নি, রাত পোহালেই সমস্ত জানাজানি হয়ে যাবে। কয়েদখানা থেকে তুমি পালিয়েছ জানবার পর কি তারা সহজে ক্ষান্ত হবে? চারদিক তোলপাড় করে তোমাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করবে। কাজেই আমাদের ফিরতে হবে অনেক ঘোরা পথে—যেদিকে আমাদের যাবার কোন সম্ভাবনাই তারা ভাবতে পারবে না। অবশ্যি তাতে সময় লাগবে

বেশি, কিন্তু কী করা !'

'তা হলে এখন—'

'তাই ভাবছি। তুমি ক্রোশ-দুই হাঁটতে পারবে তো? আমার কাঁধে ভর দিয়ে? ফিরিঙ্গির চক থেকে আমরা খুব বেশি দূরে নেই, বারোদীঘি যেতে হলে এখান থেকে উত্তর দিকে যেতে হয়, কিন্তু আমরা আপাতত যাব দক্ষিণে। শ্যামলাই নামে একটা ছোট গ্রামে আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক থাকেন। ভারি ভাল লোক। আজ রাতটার মত তাঁরই ওখানে গিয়ে তো আশ্রয় নেওয়া যাক, তারপর কাল সকালে ভেবে-চিন্তে যা হয় করা যাবে।'

দুইজন ধীরে ধীরে হাঁটিতে লাগিল। মাঝে কয়েকবার ফকির জয়ন্তকে কাঁধে লইয়া চলিবার প্রস্তাবও করিয়াছিল, কিন্তু লাজুক জয়ন্ত তাহাতে রাজি হইল না।

শ্যামলাই পৌঁছিতে বেশ রাত হইয়া গেল। সমস্ত গাঁ তখন ঘুমে আচ্ছন্ন। ফকির একটি অনতিবৃহৎ অট্টালিকার সামনে আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিল। একটু পরেই ভিতরে পদশব্দ শোনা গেল এবং একজন বলিষ্ঠ লোক আলো লইয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। ফকিরকে দেখিয়াই কিন্তু তার মুখ বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিল —'আপনি!'

ফকির হাসিয়া কহিল, 'হ্যাঁ, আমি,—ফকির সাহেব। দত্তজা জেগে আছেন? অনেক কথা আছে; চল, ভিতরে চল। এস জয়ন্ত!'

গৃহস্বামী দত্তজা মহাশয় তখনও শয্যা গ্রহণ করেন নাই। এত রাত্রে অপ্রত্যাশিতভাবে সিক্তবেশ ফকির সাহেবকে দেখিয়া তিনিও কম বিস্মিত হন নাই। ফকির তাঁহাকে ইঙ্গিতে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইল। তারপর উভয়ে খানিকক্ষণ কি আলোচনা হইল।

তারপর শুরু হইল তোড়জোড় করিয়া রান্না। এবং বহুদিন পরে জয়ন্ত তৃপ্তির সঙ্গে ভরপেট খাইয়া কোমল শয্যায় দেহ এলাইয়া দিল।

জয়ন্তের যখন ঘুম ভাঙিল তখন বেশ বেলা হইয়াছে। জানলার

ফাঁক দিয়া এক-ঝলক টাটকা রোদ তার মুখের উপর লুটোপুটি করিতেছে। এরকম দৃশ্য বহুদিন তার চোখে পড়ে নাই। আরও খানিকক্ষণ শুইয়া শুইয়া সে এই মধুর আলস্যটুকু উপভোগ করিতে লাগিল।

একটু পরেই দরজা ঠেলিয়া একজন বলিষ্ঠ ভদ্রলোক হাসিমুখে ঘরে ঢুকিলেন। 'এই যে, ঘুম ভাঙল? বেশ, বেশ। এইবার মুখ-টুক ধুয়ে একটু জল-টল খেয়ে নাও। তারপরই কিন্তু বেরোতে হবে। ঘোড়া-টোড়া সব তৈরি। তোমার সঙ্গে আরও চার-পাঁচ জন যাবেন যে! তাঁরাও সবাই তৈরি হয়ে আছেন।'

জয়ন্ত ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। প্রথমেই তার মুখ দিয়া প্রশ্ন বাহির হইল, 'ফকির সাহেব?'

'ফকির সাহেব? তিনি তো ভোরে উঠেই চলে গেলেন। অবশ্যি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার সব রকম ব্যবস্থাই তিনি ঠিক করে দিয়ে গেছেন। আশা করি এবার আর কোন বিপদ হবে না। বললাম, ছেলেটি উঠুক তার সঙ্গে দেখা করে তারপরই নাহয় যাবেন। তা তাঁর আর তর সইল না। আচ্ছা পাগলাটে লোক যা-হোক!' বিমল হাসিতে ভদ্রলোকের মুখ ভরিয়া উঠিল।

চন্দনার জমিদার-বাড়ির বিশ্রাম-কক্ষ। আজও নন্দ চৌধুরী তাকিয়ায় ঠেস দিয়া চক্ষু বুজিয়া পরম আরামে আলস্য-সুখ উপভোগ করিতেছে। পাশে হাতির দাঁতের নস্যদানি হইতে সুরভিত নস্য ক্ষণে-ক্ষণে তার নাসারন্ধ্রে ঢুকিয়া আরামের আমেজটাকে যেন আরও দীর্ঘায়িত করিয়া তুলিতেছে। অদূরে রাসবিহারী শিবনাথ এবং আরও দু-একজন পারিষদ বসিয়া আছে, আর আছেন আমাদের পূর্বপরিচিত ব্যাকরণবাগীশ মহাশয়। নন্দ চৌধুরীকে তাঁর জ্ঞাতি-গোত্রের কুশল-সমাচার দিতে সবে শুরু করিয়াছেন, রাসবিহারী অধৈর্য কণ্ঠে কহিল, 'আরে থামাও তোমার বাজে বকুনি! তোমার আত্মীয়-

পরিজনের খবর জানবার জন্য চৌধুরী মশায়ের যেন আর ঘুম হচ্ছে না! কাজের কথা কিছু থাকলে বল।'

ব্যাকরণবাগীশ একটু ভড়কাইয়া গিয়া কহিলেন, 'আমি আর কী বলব? চৌধুরী মশাই-ই তো আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন।'

নন্দ একবার হাই তুলিয়া একটু পাশ ফিরিল। চোখ খুলিয়া বলিল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিই খবর পাঠিয়েছিলাম বটে। তা বাগীশ মশাই, তোমাকে তো আর-একবার বারোদীঘি যেতে হচ্ছে।'

রাসবিহারী বাধা দিয়া কহিল, 'আবার! অত অপমানের পরেও?'

নন্দ হাসিয়া কহিল, 'আরে, তুমি বড় রগ-চটা! অপমান আবার কিসের। মানী লোক কথার ঝোঁকে দু-একটা কড়া কথা বলেছেন তো হয়েছে কী! গায়ে মাখলেই অপমান—না মাখলেই নয়।'

'কিন্তু—'

'আর কিন্তু-টিন্তু নেই। শোন বাগীশ মশাই। মৃগাঙ্ক রায়ের ছেলেটাকে তো ফিরিঙ্গিরা ধরে নিয়ে গেছে। সহজে আর ছাড়ছে না। তাকে বাদের মধ্যেই ধরুন। আর এই ব্যাপারের পর রায় মশাইও যে বেশিদিন টিঁকে থাকবেন—আর টিঁকে থাকলেও বিষয়-আশয় নিয়ে মাথা ঘামাতে পারবেন তা মনে হয় না। শেষ পর্যন্ত ও জমিদারি তার মেয়ের কপালে নাচছে। তুমি গিয়ে রায়মশাইকে বুঝিয়ে বলবে। এত বড় জমিদারিটা সাতে পরে লুটে খাবে—তার চাইতে আমাদের কথাটা ভেবে দেখুন। অত বড় আর-একটা জমিদারি যারা চালিয়ে আসছে তাদেরই হাতে ওঁরটারও ভার দেওয়াই সুবিবেচনার কাজ হবেনা কি?'

'কিন্তু ওঁর মেয়েটি,—শুনেছি বড্ড একরোখা আর তেমনি মেজাজি। দেখলামও তাই। তার মত—'

'আরে রেখে দাও। ছেলেমানুষ, তার আবার মতামত কী! বাপ-খুড়ো যা বলবে তাই সুড়-সুড় করে মেনে নেবে। তুমি

যাও, আজই বেরিয়ে পড়।'

'না হলে—' রাসবিহারী যোগ করিল, 'রায়মশাইকে এও বুঝিয়ে দিয়ে আসবে যে তিনি বড় শক্ত জায়গায় ঘা দিয়েছেন—খোদ ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে লাগতে গেছেন। তার ওপর যদি ঘরের শত্রু বাড়ান তাহলে—হ্যাঁ, তাহলে চন্দনাও তাঁর বিরুদ্ধে ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে হাত মেলাতে ইতস্তত করবে না।'

'আঃ, রাসবিহারী!'—নন্দ মৃদু ভর্ৎসনার সুরে কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়া আবার কাত হইয়া শুইল।

ব্যাকরণবাগীশ ছাতা বগলে করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। খানিকক্ষণের জন্য সকলেই চুপ, তারপর কথা কহিল শিবনাথ। কহিল, 'ওদিকে চাঁদপালের খবর শুনেছেন? ইব্রাহিম খাঁকে তো ঘোল খাইয়ে ছাড়ছে!'

'কে ইব্রাহিম খাঁ?' তরুণ জমিদার প্রশ্ন করিল।

'সুবেদার;—এখন যিনি জাহাঙ্গিরনগরে নবাবের গদিতে বসেছেন। অবশ্যি বেশিদিন থাকবেন না, দিল্লী থেকে নতুন লোক এলেই গদি ছেড়ে দিতে হবে। তা যাই হোক, চাঁদপাল এবার তাঁকে বড় ধাঁধায় ফেলেছে।' বলিয়া শিবনাথ চাঁদপাল-ঘটিত সমস্ত কাহিনী খুলিয়া বলিল।

'আরে, এ যে মস্ত খবর!'—রাসবিহারী সোৎসাহে চেঁচাইয়া উঠিল।

খবরটা বাস্তবিকই মস্ত. নন্দ চৌধুরী পর্যন্ত ঔৎসুক্য দেখাইয়া কহিল, 'তাই নাকি! খুব বাহাদুর তো এই চাঁদপাল!'

রাসবিহারী কহিল, 'আমার কথাটা উড়িয়ে দেবেন না চৌধুরী মশাই! আমাদের কাছে ও নবাবও যা ফিরিঙ্গিও তা। বরঞ্চ এই সুযোগে চাঁদপালের সঙ্গে খাতির জমিয়ে রাখতে পারলে সময়ে হয়ত বেশ কিছু গুছিয়ে নেওয়া যাবে। আপনি বললে চাঁদপালের কাছে —চাই কি আমি নিজেই গিয়ে কথাবার্তা পাড়তে পারি। আর

মৃগাঙ্ক রায়ের ওপর ফিরিঙ্গিরা যা খাপ্পা—তার বিরুদ্ধ-দল জানলে ওদের কাছেও বেশ খাতির পাওয়া যাবে। কী বলেন?'

নন্দ চৌধুরীকে যেন আজ একটু চিন্তাগ্রস্ত মনে হইল। সে তখনই কোনও উত্তর না দিয়া একটিপ নস্য নাকের মধ্যে গুঁজিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

সুশ্বেতা মুখ খুলিল ২২

বেলা তখনও শেষ হয় নাই, সূর্য পশ্চিমের দিকে অনেকটা হেলিয়া পড়িয়াছে মাত্র। রাধামাধবের মন্দিরে বৈকালিক পূজার্চনার আয়োজন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। মন্দিরের অনতিদূরে, উদ্যানেরই এক কোণে দুখানি বেতের কেদারায় মৃগাঙ্ক রায় ও রসরাজ বসিয়া মৃদুস্বরে আলাপ করিতেছিলেন। রসরাজ মাত্র আজই সকালে জাহাঙ্গিরনগর হইতে ফিরিয়াছেন, এবং সে বিষয়েই এখন আলোচনা চলিতেছিল।

মৃগাঙ্ক রায়ের চেহারায় এ কয়দিনে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। একে জয়ন্তের চিন্তা, তার উপর রাধামাধবের গলা হইতে রহস্যজনকভাবে রত্নহারের অন্তর্ধান—তাঁর মনের উপর বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। মনের সেই ভাব মুখে-চোখেও চাপা নাই।

রসরাজ এই রত্নহারের অন্তর্ধানের খবরটি জানিতেন না, এখানে আসিয়া শুনিলেন। ওদিকে জয়ন্তেরও কোন খবর নাই, জাহাঙ্গিরনগরের সফরও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় শেষ হইয়াছে। কোন দিক দিয়াই যেন কূল-কিনারা পাওয়া যাইতেছে না। রাধামাধব এ কী পরীক্ষায় ফেলিলেন!

দূরে একটি লোককে ছাতা বগলে আসিতে দেখা গেল। মন্দিরের সম্মুখে সকলেই যাতায়াত করিতে পারে; দেবস্থান,—কোন বাধা নাই; মৃগাঙ্ক রায় তাই সেদিকে তেমন খেয়াল করিলেন না। কিন্তু

ছত্রধারী মন্দিরের দিকে না গিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাদেরই দিকে আগাইয়া আসিল। এবার চিনিতে কষ্ট হইল না—আর কেহই নন, ঘটক হরিদাস ব্যাকরণবাগীশ মহাশয়।

এই অসময়ে ব্যাকরণবাগীশকে দেখিয়া মৃগাঙ্ক রায়ের পিত্ত জ্বলিয়া গেল ; কিন্তু কিছুদিন যাবৎ সময় তাঁর বড় খারাপ যাইতেছে ; ব্রাহ্মণকে অপমান করিয়া অনর্থক আর অভিশাপ কুড়াইয়া নতুন. করিয়া আরও অমঙ্গল ডাকিয়া আনিবার সাহস তাঁর হইল না। শুষ্কমুখে একবার শুধু 'আসুন' বলিয়া তিনি চাকরকে বসিবার আসন আনিয়া দিবার জন্য আদেশ দিলেন।

ব্যাকরণবাগীশ যথারীতি কুশল-সংবাদ লইয়া ও দিয়া একটু ইতস্তত করিয়া শেষে তাঁর আসিবার উদ্দেশ্য নিবেদন করিলেন।

'তারপর রায় মশাই, ছেলের তো বোধহয় কোন খোঁজই পাওয়া গেল না! তা জমিদারিটাও তো দেখতে হয়! এ অঞ্চলের এমন ডাকসাইটে ঘর, রাজার রাজত্ব বললেই হয়, তা তো নষ্ট করা উচিত হবে না! আর মা-লক্ষ্মীও বেশ ডাগরটি হয়ে উঠেছেন।'

মৃগাঙ্ক রায় উদ্যত ক্রোধ দমন করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, 'হুঁ।'

'তাই বলছিলাম, চন্দনার চৌধুরী মশায়ের প্রস্তাবটা আর একবার ভেবে দেখলে হত না? ঘরে-বরে সব দিক দিয়েই…'

'ঘটক মশাই, আপনাকে না বার বার বারণ করেছি, ও প্রসঙ্গ আমার কাছে আর তুলবেন না? মেয়ের বিয়ে আমি আর যেখানেই দিই ঐ অপদার্থের কাছে দেব না এটা ঠিক। তা ছাড়া এখন আমার মনের যা গতি—'

'আজ্ঞে, সেইজন্যই তো বলছিলাম। ছেলেটির আশা তো এক-রকম ছেড়ে দিতেই হয়েছে, আপনারও দেহ-মনের এই অবস্থা। এখনই তো এ বিষয়ে ভাববার সময়। আর চৌধুরী মশাইকে আপনি যতটা হেলাফেলা করছেন বাস্তবিক পক্ষে—'

এবারে বাধা দিবার পালা রসরাজের। ব্যাকরণবাগীশকে

থামাইয়া বেশ একটু উচ্চস্বরেই তিনি কহিলেন, 'সে-ই বুঝি আবার আপনাকে ওকালতি করতে পাঠিয়েছে? হুঁ, যতটা বোকা ভেবে-ছিলাম তা তো নয় দেখছি! এত বড় জমিদারিটা যদি এই ফাঁকে হাত করা যায়! তা ছাড়া—আচ্ছা ঘটক মশাই, আপনি তো অনেক খবরই রাখেন শুনেছি। বলতে পারেন, এই যে গুজব রটেছে—চাঁদপালের সঙ্গে আরও যেসব ছোটখাট জমিদার ফিরিঙ্গিদের হাতে হাত মিলিয়েছে তার মধ্যে চন্দনাও একটি—এর সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন? বারোদীঘির সঙ্গে চন্দনার শত্রুতা পুরুষানুক্রমের—কিন্তু তা কি এতই বড়, যে এইভাবে চুদিক দিয়ে তাকে ফাঁদে ফেলে ধ্বংস করতে হবে?' রসরাজের কণ্ঠস্বর ক্রমেই উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

ব্যাকরণবাগীশ এমনটা আশা করেন নাই; কোন খবরই কি ইহাদের কানে আসিতে বাকি নাই! আমতা আমতা করিয়া কি যেন বলিতে গেলেন, কিন্তু রসরাজের ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তা চাপা পড়িয়া গেল—'আপনার ঘটক-বিদায়টাই বড় হল? জেনে শুনে একটা সম্ভ্রান্ত পরিবারের এত বড় সর্বনাশ করতে আপনার একটুও বাধছে না! কিন্তু আমি রায়মশাইয়ের মত খাঁটি বোষ্টম নই, একটু-আধটু মা কালীরও পুজো করি, আমি অত সহজে ছাড়তে দেব না! বলবেন আপনার চৌধুরীকে—যারা ফিরিঙ্গির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস রাখে, তারা ঐ-সব চুনোপুঁটির সঙ্গে কারবার করে না।'

রসরাজের বাক্যস্রোতে বাধা পড়িল। একজন পরিচারিকা অবগুণ্ঠন টানিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যাকরণবাগীশের দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, 'দিদিমনি আপনাকে কী বলবেন, একটু এদিকে দাঁড়াতে বলছেন।'

'আমাকে!'—ব্যাকরণবাগীশ কাঁচুমাচু মুখে কহিলেন। জবাব দিলেন রসরাজ, 'হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছেন না? যান, মা-লক্ষ্মীর নিজের মুখেই জবাবটা শুনে আসুন গিয়ে।'

মন্দিরের সিঁড়ির নিচে সুশ্বেতা দাঁড়াইয়া ছিল। মৃগাঙ্ক রায়ের

মত তারও সুন্দর মুখখানি দুশ্চিন্তার ছাপে মলিন হইয়া গিয়াছে। ব্যাকরণবাগীশ কাছে যাইতেই সে মৃদুস্বরে কহিল, 'আপনি কেন রোজ-রোজ বাবাকে বিরক্ত করতে আসেন বলুন তো? আমাদের মনের ভাব আপনারা ভাল-মতই জানেন। চন্দনার ওঁদের আমরা চিরকাল শত্রু বলে জেনে এসেছি। এখনও এমন কোনও ঘটনা ঘটে নি যাতে সে ভাব বদলাবার কোন কারণ থাকতে পারে। আর —' সুশ্বেতা ক্ষণেক দ্বিধা করিয়া কহিল, 'আর আপনাদের এই নতুন জমিদারের অপদার্থতার কথা দেশ-শুদ্ধ কে না জানে? কাপুরুষকে কেউ সম্মান করতে পারে না। এমন কী সৎ কাজটা তিনি আজ পর্যন্ত করেছেন যার জন্য এমন একটা প্রস্তাব পাঠাবার স্পর্ধা তাঁর হতে পারে!'

মেয়েটির প্রগল্‌ভতা দেখিয়া ব্যাকরণবাগীশ ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু সুশ্বেতার আজ যেন খুন চাপিয়াছে, মুখে তার কিছুই আটকাইবে না। কহিল, 'যান, বলবেন আপনাদের সেই জমিদারটিকে, এখন পর্যন্ত যে যোগ্যতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন তাতে তাঁকে এ বাড়িতে বর হয়ে আসা দূরে থাক, বরকন্দাজ হয়ে আসবার উপযুক্ত বলেও আমরা মনে করি না। হ্যাঁ, ঠিক এই কথাই বলবেন।' সুশ্বেতা বেণী দোলাইয়া ব্যাকরণ-বাগীশের দিকে আর মুহূর্তও ফিরিয়া না চাহিয়া সিঁড়ি বাহিয়া মন্দিরের ভিতর চলিয়া গেল।

ব্যাকরণবাগীশ হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। ব্যাপারটা এমনই অভাবনীয়, যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর মাথায় তা ভাল করিয়া প্রবেশ করিল না। তাঁর চমক ভাঙিল সহসা-অশ্ব-খুরশব্দে। মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, চার-পাঁচ জন অশ্বারোহী তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া মন্দিরের অনতিদূরে আসিয়া থামিল। তাদের অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাইতে-ছিল। ঘোড়াগুলিও ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছে, মুখ দিয়া ঘন-ঘন ফেনা বাহির হইতেছে।

অশ্বারোহীরা ঘোড়া হইতে নামিলে দেখা গেল, তাদের মধ্যে একজন অল্পবয়স্ক বালক। পরমুহূর্তে দেখা গেল, রসরাজ মৃগাঙ্ক রায়কে ধরিয়া একরকম টানিতে টানিতেই সেইদিকে ছুটিয়া আসিতেছেন। মুখ দিয়া শুধু অস্ফুট স্বরে শোনা যাইতেছে—'জয়ন্ত! জয়ন্ত! জয়ন্ত!'

ইব্রাহিম খাঁর উভয়-সঙ্কট ২৩

সন্ধ্যা হয়-হয়। জাহাঙ্গিরনগরের কেল্লার উপর রাত্রির ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে। সেই আধ-অন্ধকারে অলিন্দের উপর একটি ছায়ামূর্তি অস্থিরভাবে পদচারণা করিতেছিল। ছায়ামূর্তিটি আর কাহারও নয়, বাংলার সুবেদার স্বয়ং ইব্রাহিম খাঁর।

ইব্রাহিম খাঁ কয়েকদিন যাবৎ বড় দুর্ভাবনায় দিন কাটাইতেছেন। চাঁদপালের চিঠির তিনি কড়া উত্তর দিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন চাঁদপাল হয়ত মিথ্যা হুমকি দিয়া তাঁকে বোকা বানাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু চাঁদপালের দম্ভ যে অলীক নয়, সে সংবাদ পাইতেও তাঁর বেশি দেরি হয় নাই। সেই অদ্ভুত রোগের কথাই বলিতেছি। প্রায় প্রত্যহই কোন-না-কোন গ্রাম হইতে খবর আসিতেছে—আজ অমুক লোকে এই ব্যারামে আক্রান্ত হইয়াছে, আজ অমুকে। হতভাগ্য প্রজারা সুবেদারের কাছে প্রতিকারের জন্য কাতর আবেদন জানাইতেছে; কিন্তু সুবেদার কী করিবেন! এই অদ্ভুত পরিস্থিতি হইতে উদ্ধার পাইবার কোন পথই তিনি খুঁজিয়া পাইতেছেন না।

পরিচারক আসিয়া আলো জ্বালাইয়া দিল। কুনিশ করিয়া কহিল, 'হোসেন সাহেব, কাজি সাহেব আর চৌধুরী মশাই বাইরে অপেক্ষা করছেন।'

'তাঁদের এখানেই নিয়ে এস।'—নবাব কহিলেন। ভৃত্য আবার কুনিশ করিয়া চলিয়া গেল।

হোসেন সাহেব নবাবের প্রধান নৌসেনাধ্যক্ষ। কাজি ও চৌধুরী উভয়েই নবাব সরকারের অতি উচ্চ কর্মচারী, বয়সে প্রবীণ। নবাব মন্ত্রণা করিবার জন্য তাঁহাদের ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

একটু পরেই তাঁহারা আসিয়া অভিবাদন জানাইলেন। নবাব আসন গ্রহণ করিয়া তাঁহাদেরও বসিতে বলিলেন। তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, 'কী ঠিক করলেন তাহলে?'

'আজ্ঞে আমার তো মনে হয়, আর দেরি না করে অবিলম্বে নিমপুকুর আক্রমণ করাই উচিত।' দেওয়ান হরিনারায়ণ চৌধুরী উত্তর দিলেন।

'আপনারও কি তাই মত?'—নবাব হোসেন সাহেবের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন।

'তাই তো ভাবছি! ওদিকে সাতগাঁয় একটা বড় ফৌজ পাঠাতে হয়েছে। হুগলিতে ফিরিঙ্গিরা নাকি খুবই তোড়জোড় করছে—সাতগাঁয় একটা বড়রকম আক্রমণ করবে। সাতগাঁ ওদের হাতে গেলে সুবে বাংলার আর রইল কী? এদিকে ধলেশ্বরী করতোয়া কর্ণফুলি থেকে শুরু করে মধুমতী ভৈরব জলাঙ্গী—সর্বত্র বড়-বড় ডাকাতির খবর আসছে। সরস্বতী বা গঙ্গার কথা নাহয় ছেড়েই দিচ্ছি। বড়-বড় মোহানাগুলোয় সাধারণ পাহারাদার থাকা না-থাকা সমান—সর্বত্র সশস্ত্র সৈন্য মোতায়েন করা দরকার। এ অবস্থায়—'

'আপনার হাতে এখন কতগুলি ছিপ আছে?'

'সব তো নানা জায়গায় ছড়ানো। গুছিয়ে একত্র করতে কিছু সময় লাগবে। অন্তত দিন দশ-পনেরো।'

'বলেন কী! না না, অতদিন সবুর করা যায় না। আচ্ছা, কোশা?'

'তারও তো ঐ অবস্থা।'

'তাহলে তো বড় জাহাজ নিয়েই তৈরি হতে হবে। অবশ্য যদি এখনই আক্রমণ করা উচিত মনে করেন।'

এবারে কথা বলিলেন কাজি সাহেব। কহিলেন, 'কিন্তু আমার মনে হয়, একটু ভেবে-চিন্তে ও-কাজ করা ভাল। চাঁদপাল তো একা নয়, দুর্ধর্ষ ফিরিঙ্গি সৈন্যেরা আজ তার সহায়। তা ছাড়া নবাব সাহেবের নিশ্চয়ই কানে এসেছে, দলে দলে ছোট-বড় জমিদার চাঁদপালের সঙ্গে ভিড়ে এই সুযোগে কিছু গুছিয়ে নেবার চেষ্টায় আছে। পূর্ববঙ্গের আওলাতগঞ্জ, শুকদ্বীপ, জনকপুর, শ্যামপুকুর—ওদিকে সুজাবাদ, কয়লাপটি, বেগুনতলি, সুবাসনগর, চন্দনা—কত নাম করব! এর সবকটির জমিদার, শুনতে পেলাম, নবাবের বিরুদ্ধে চাঁদপালের সঙ্গে ঘোঁট পাকাচ্ছে। সবাই স্বাধীন হতে চায়।'

এ খবর ইব্রাহিম খাঁরও কানে আসিয়াছিল। তিনি তাই অকস্মাৎ বড় গম্ভীর হইয়া গেলেন। কাজি সাহেব কহিলেন, 'ওদিকে, শুনেছেন বোধহয়, সেবাইতগঞ্জের কাছে সে অঞ্চলে ফৌজদার চাঁদপালের লোকের সঙ্গে লড়তে গিয়ে কী নাকাল হয়েছে!'

এ খবরটিও সকলেই জানে, তাই চট করিয়া কেহ জবাব দিতে পারিল না। আবার খানিকক্ষণ ধরিয়া একটা ঘন নিস্তব্ধতা জায়গাটিকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিল।

দূরে কেল্লার ফটকের কাছে ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল। প্রহরী প্রহর জানাইতেছে বুঝি। ইব্রাহিম খাঁ যেন হঠাৎ সম্বিত পাইয়া উঠিয়া বসিলেন—'তাহলে কি শেষ পর্যন্ত চাঁদপালের কাছে আপোস মীমাংসার জন্যই চিঠি দিতে হবে?'

কেহ জবাব দিল না। ইব্রাহিম খাঁ আবার কহিলেন, 'তবে তাই হোক। দেশশুদ্ধ লোকের জীবন বিপন্ন করে নবাব-পক্ষের মুখরক্ষা না-হয় নাই হল। ঐ অদ্ভুত রোগ আর ছড়ানো চলে না, যেভাবে হোক বন্ধ করতেই হবে। নইলে দেশ জুড়ে বিদ্রোহ হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়।'

পরদিন খুব ভোরেই নবাবের দূত পত্র লইয়া নিমপুকুরের উদ্দেশ্যে

রওনা হইয়া গেল। অন্তরীক্ষে বিধাতাপুরুষ বোধহয় একটু মুখ টিপিয়া হাসিলেন। কেন, তা পরে বলিতেছি।

গোপন পরামর্শ ২৪

নিমপুকুর গ্রামে কয়েকদিন হইল বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সুবেদার ইব্রাহিম খাঁর নরম সুরের সন্ধিসূচক পত্রের কথা আর কাহারও বড় জানিতে বাকি নাই। চাঁদপাল এবার অনেক কিছুই গুছাইয়া লইতে পারিবে। সংবাদটি যেমন একদিক দিয়া আশ্রিতের দলে পুলকের সৃষ্টি করিয়াছে, তেমনি এক শ্রেণীর প্রজাদের মধ্যে আনিয়াছে দারুণ আতঙ্ক। এতদিন তবু উপরে একজন থাকায় কিছুটা ভরসা ছিল, এখন হইতে সে বাধাও অপসারিত হইবে। স্বেচ্ছাচারী চাঁদপালের সেই ভয়াবহ মূর্তি কল্পনা করিয়াই এই আতঙ্ক।

যেসব ছোট-বড় জমিদার নবাবের বিরুদ্ধে চাঁদপালের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল তাদের সকলকেই আজ নিমপুকুরে ডাকা হইয়াছে। উদ্দেশ্য —পরবর্তী কর্মসূচী সম্বন্ধে একটা ভাল রকম আলোচনা করা। চাঁদপাল স্বেচ্ছাচারী, চাঁদপাল ধূর্ত—স্বার্থপর, কিন্তু এমন একটা বড় কাজে নামিলে অপরের সাহায্য ছাড়া যে আগানো যায় না তা সে ভালমতই জানে। তাই এই ব্যবস্থা।

চাঁদপালের দরবার-গৃহে বৈকালের দিকে পরামর্শ-সভা বসিল। অনেকেই আসিয়াছে। কয়লাপটি, সুজাবাদ, বেগুনতলি, সুবাসনগর, শ্যামপুকুর, শুকদ্বীপ, আওলাতগঞ্জ, জনকপুর, দোলাইখাড়ু, মেঘচাঁদা —সকল জায়গারই জমিদারেরা সঙ্গে দু-একজন করিয়া অনুচর লইয়া সভায় যোগ দিয়াছেন। ইহাদের সকলেই যে চাঁদপালকে খুব বিশ্বাস করেন তা নয়, কিন্তু নিজ-নিজ স্বার্থ ও এমন একটা অভাবনীয় সুযোগের প্রলোভনে তাঁরা আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। চাঁদপালও

এইসব মানী অতিথিদের যতটা সম্ভব খাতির-যত্ন করিতে ত্রুটি করে নাই।

সভার কাজ শুরু হইল। দেওয়ান রুদ্রকান্ত সকলকার পরিচয় করাইয়া দিলেন। চন্দনার তরফ হইতে আসিয়াছে রাসবিহারী। রুদ্রকান্ত পরিচয় করাইয়া দিতেই চাঁদপাল প্রশ্ন করিল, 'ও, আপনি একা এসেছেন! চৌধুরী মশায় এলেন না?'

সভার সকলেই আড়ালে একটু মুখ টিপিয়া হাসিল। নন্দ চৌধুরীর স্বভাবের কথা কারোই অজানা ছিল না, চাঁদপালও জানিত। অলস নন্দ চৌধুরীর পক্ষে তোড়জোড় করিয়া এতখানি পথ আসা খুবই একটা আশ্চর্য ব্যাপার। তবে কিনা, গরজ বড় দায়। এমন একটা অভাবনীয় সুযোগ হাতছাড়া হইয়া যাইবে! আর—আরও একটা উদ্দেশ্য আছে। বারোদীঘির সঙ্গে চন্দনার শত্রুতা বহুদিনের। ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে যোগ দিয়া সেই বারোদীঘিকে কিছুটা শিক্ষা দেওয়ারও সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। চাঁদপালের সহায়তা এই ব্যাপারে পরম লোভনীয়। তাই চন্দনা অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়াই এই দলে যোগ দিয়াছে।

রাসবিহারী মুখখানা একটু কাঁচুমাচু করিয়া কহিল, 'হ্যাঁ, তিনিও আসছেন। তবে এখন তো সবটা পথ নৌকো আসছে না, খানিকটা পথ ঘোড়ায় আসতে হয়। চৌধুরী মশায় আবার—' রাসবিহারী একবার ঢোঁক গিলিয়া লইল—'চৌধুরী মশায় আবার ঘোড়ায় চড়া তেমন পছন্দ করেন না। তাঁর জন্য তাই গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি অনেকক্ষণ রওনা হয়েছেন—কয়েক দণ্ডের মধ্যেই বোধহয় পৌঁছে যাবেন।'

চাঁদপাল হাসিয়া কহিল 'ও! তা, তার জন্য গরুর গাড়িতে বেশ পুরু করে গদি পেতে দেওয়া হয়েছে তো? এদিককার রাস্তা-ঘাট আবার বড় এবড়ো-খেবড়ো কিনা!'

ঘরের সবাই, যারা এতক্ষণ মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল, এবার

প্রকাশ্যেই হাসিয়া ফেলিল। রাসবিহারী মুখ নিচু করিয়া কহিল, 'আর তিনি আসছেন শুধু আপনাদের সম্মান রাখবার জন্য। কথা-বার্তা যা সব আমিই বলতে পারব। তিনি আর কতটুকুই বা নিজে করেন! সবই তো আমার ওপর...'

রাসবিহারীর কথা ভাল করিয়া শেষ হইবার আগেই দ্বারোয়ান আসিয়া সেলাম করিয়া কহিল, 'হুজুর, একখানা গরুর গাড়ি করে কে যেন এসেছেন।'

'ঐ এসে গেছেন বুঝি! রুদ্রকান্ত, দেখ তো! যাও, ভিতরে নিয়ে এস।'

রুদ্রকান্ত তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন এবং একটু পরেই নন্দ চৌধুরীকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। নন্দর পরনে ফিনফিনে ধুতি, গায়ে মিহি রেশমি পিরান আর গরদের চাদর। পায়ে সৌখিন মখমলের লপেটা শ্রেণীর জুতা। চাঁদপাল অভ্যর্থনা করিয়া অদূর-বর্তী তাকিয়া দেখাইয়া দিল। নন্দ বিনা বাক্যব্যয়ে তাকিয়ার উপর গিয়া কাত হইয়া পড়িল এবং হাতের মুঠা হইতে হাতির দাঁতের নস্যদানটি বাহির করিয়া একটিপ নস্য নাকে গুঁজিয়া দিল। রাস-বিহারী গিয়া তাহার পাশে বসিল।

আলোচনা চলিল বহুক্ষণ। জমিদারদের অনেকেই অনেক প্রস্তাব করিলেন, নিজের-নিজের দাবি জানাইতেও ভুলিলেন না। নন্দর হইয়া রাসবিহারীও আলোচনায় যোগ দিল সাধ্যমত তর্ক করিল, চন্দনার দাবি পেশ করিতেও ছাড়িল না।

কিন্তু পাদ্রি বারেটোর মত না লইয়া কোন সিদ্ধান্তই করা যায় না। বারেটোর সহিত একবার চাঁদপালের মুখোমুখি বসিয়া আলো-চনা করা দরকার—বারেটোব মতই সমস্ত পর্তুগিজ দলের মত। অবিলম্বেই এই সাক্ষাতের আয়োজন করিতে হইবে। তা ছাড়া রত্নহার সম্বন্ধেও দু-একটি দরকারি কথা জানা দরকার।

কিন্তু কোথায় সাক্ষাৎ করা যায়! বারেটো নিজে নিমপুকুরে

নিশ্চয়ই আসিবে না। আর ফিরিঙ্গির চকে গিয়া পর্তুগিজ দুর্গের ভিতরে ঢুকিয়া তার সহিত দেখা করিতেও চাঁদপাল নারাজ। উভয়েই সমান ধূর্ত। এখন প্রয়োজনের খাতিরে যত বন্ধুত্বই হউক না কেন, কেহই অপর পক্ষের সম্পূর্ণ হাতের মুঠার মধ্যে ঢুকিতে রাজি নয়। এমন একটা জায়গায় সাক্ষাতের আয়োজন করিতে হইবে যা দু-জনের পক্ষেই সমান নিরাপদ অথচ গোপনীয়। কিন্তু কথাটা খোলাখুলি বলা যায় না—চক্ষুলজ্জায় বাধে।

তখন ঠিক হইল, অবিলম্বে বারেটোর কাছে কৌশলপূর্ণ চিঠিতে সময় ও স্থান নির্বাচন করিয়া একজন বিশ্বাসী লোক পাঠানো হইবে। এবং সে বারেটোর সম্মতি লইয়া ফিরিয়া আসিলেই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। হাতে সময় বেশি নাই। বারেটোর বিশ্বস্ত অনুচর বিব্বু কাছাকাছিই আছে, তাকে দিয়া খবর পাঠাইলেই সবচেয়ে ভাল হইবে।

পরামর্শ শেষ হইলে চাঁদপাল পরিশ্রান্ত জমিদারবৃন্দের পছন্দমত কাহাকেও ঠাণ্ডা সরবং কাহাকেও সিদ্ধির সরবৎ এবং কাহাকেও বা শ্রমহারী পানীয় দিয়া আপ্যায়িত করিল। শেষোক্তটি হইতে সে নিজেও বঞ্চিত হইল না।

বৈরাগী-সংবাদ

২৫

শাঁখরাইলের কাছে মাদারপাড়ার সেই চটিটির কথা নিশ্চয়ই মনে আছে? সেই যেখানে রসরাজ প্রথম রত্নহারের সন্ধান পান?

পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার কয়েক দিন পরের কথা। সন্ধ্যার কিছু পরে চটির সম্মুখস্থ খোলা আঙিনায় কয়েকজন লোক বসিয়া জটলা করিতেছিল। তাদের সামনে একজন বৈরাগী বসিয়া বসিয়া একতারায় ঝঙ্কার দিতেছিল। বৈরাগীর মুখখানা যেন চেনা-চেনা।

ভিড়ের মধ্য হইতে কে একজন বলিল, 'আর-একখানা হোক

না দাদা! রাত এখনও বেশি হয় নি।'

বৈরাগী বার-ছুই কাশিয়া লইয়া গাহিতে শুরু করিল—

'কে কারে হারায় রে বন্ধু, হারায় কে কারে।
সংসারে নিয়তি বিধির কে খণ্ডাইতে পারে?
জলের মধ্যে ঘোরে মৎস্য—মাকড় ধইরা খায়,
সেই মৎস্য বকেরি ঠোঁটে যায়—তলাইয়া যায়।
মেকুর ভাবে বকের মাংস বড়ই চমৎকার,
শিয়াল আসে গুটি-গুটি নাই তাহারও পার।
বনের মধ্যে বেড়ায় শিয়াল, ব্যাঘ্রে ধরে ঘাড়,
চাইটা-চাইটা রক্ত খাইয়া আশ মেটে না তার।
আচমকা কিরাতের তীরে সেও যে লুটায় পথে,
কে জানে নিয়তি কাহার বান্ধা কিসের সাথে!
বন্ধুরে, বান্ধা কিসের সাথে!'

বৈরাগী গাহিয়া চলিল। ক্রমে ভিড় একটু-একটু করিয়া পাতলা হইয়া আসিল। বৈরাগী ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল অদূরে একজন হৃষ্টপুষ্ট গোছের লোক অন্যমনস্কভাবে তার গান শুনিতেছে। আবছা অন্ধকারেও তার চোখের ঘোলাটে দৃষ্টি বৈরাগীর চোখ এড়াইল না। লোকটা নেশা করিয়াছে।

বৈরাগী গান থামাইল। একবার হাই তুলিয়া বারকয়েক তুড়ি দিল। সমঝদারেরা বুঝিল, আপাতত আর তার গান গাহিবার মতি নাই, তারা একে-একে চটির ভিতরে চলিয়া গেল। বৈরাগী এবার ধীরে ধীরে সেই বলিষ্ঠ লোকটির কাছে আগাইয়া গেল।

'সেলাম দাদাভাই! এক-আধ ছিলিম খাওয়াতে পার? গলাটা কুঁকড়ে গেছে।'

লোকটির ঘোলাটে দৃষ্টি চকিতে কঠিন হইয়া উঠিল। সন্দিগ্ধভাবে বৈরাগীর দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া উদ্ধতকণ্ঠে সে কহিল, 'না, ওসব ক্ষুদে নেশার আমি ধার ধারি না।' কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে

তার মুখের উগ্র মদের গন্ধ আর চাপা রহিল না।

বৈরাগী হাসিমুখে কহিল, 'আরে, চট কেন দাদাভাই! ও-সব রসে কি আমরাও বঞ্চিত? তবে, যে সময়কার যা। এখন, প্রথম রাতে, ও-সব ক্ষুদে জিনিস দিয়েই শুরু করতে হয়। রাত বাড়ুক না, তারপর—' বৈরাগী চোখ কুঁচকাইয়া বাকিটুকু ইসারায় শেষ করিল।

লোকটি তখনও কোন কথা বলে না। বৈরাগী আর-একটু অন্তরঙ্গ হইবার চেষ্টা করিয়া কহিল, 'এ যে খাসা ফিরিঙ্গি রস জোগাড় করেছ দাদা! একবার নাকে শুঁকলেই ধরে দেওয়া যায়!'

এবারে লোকটি ফিরিয়া চাহিল। বারান্দার একটা আলো তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; চিনিতে কষ্ট হয় না—এ আর কেহ নয়, বিব্বু, সম্ভবত বারেটোর নিকট হইতে সংবাদ লইয়া ফিরিতেছে।

বাস্তবিকই তাই। বিব্বু প্রয়োজনীয় সংবাদ লইয়াই ফিরিতেছে, পথে রাত হওয়ায় মাদারপাড়ার চটিতে আশ্রয় লইয়াছে। আশ্রয় না লইলেও চলিত, কিন্তু মাদারপাড়ার এই চটিটির কতকগুলি ব্যাপারে সুনাম ছিল—দুর্লভ পর্তুগিজ মদ সরবরাহ করা তার মধ্যে একটি। ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে নানা ধরনের লোক এখানে আশ্রয় নেয়, ফিরিঙ্গি বণিকরাও আসে। সেইজন্যই চটির মালিককে সেসব ব্যবস্থা রাখিতে হয়। বিব্বুর ইহা জানা ছিল, কাজেই সুযোগ পাইতেই সে সুযোগকে গ্রহণ করিতে দ্বিধা করে নাই। কিন্তু এ বৈরাগীটি বলে কী! এ যে তারও উপরে যায়!

বৈরাগী বিব্বুর সন্দেহ অনুমান করিয়া কহিল, 'দেখছ তো দাদা, ঘর-ছাড়া মানুষ। আজ এখানে কাল ওখানে ঘুরে বেড়াতে হয়, ও-সব নইলে ভুলে থাকব কী করে?' তারপর পুনরায় চোখ টিপিয়া কহিল, 'কিন্তু দাদা, এ আর কী জোগাড় করেছ, আমার সঙ্গে যা আছে তার স্বোয়াদ যদি একটু পেতে! সেও ফিরিঙ্গির, কিন্তু এখানকার ফিরিঙ্গি—মানে পর্তুগিজদের নয়: আর-এক জাতের

ফিরিঙ্গি আছে—ফরাসী ফিরিঙ্গি বলে তাদের, তাদেরই তৈরি। তার কাছে এ।'

বিব্বুর দৃষ্টি এবার লোলুপ হইয়া উঠিল। কিছুটা বিস্ময় এবং কিছুটা সন্দেহমিশ্রিত স্বরে সে কহিল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি বটে ফরাসী মদ বড় তোফা জিনিস। কিন্তু তুমি—তুমি ও জিনিস পেলে কোথায়?'

'আরে আমরা কি এক জায়গায় থাকি দাদা? বললাম তো, আজ হেথায় কাল হোথায়—তুনিয়াটা চষে বেড়াচ্ছি। একবার গিছলাম তিলভেঙ্কটম্। মাদ্রাজীদের দেশ, কিন্তু বহু ফরাসী ফিরিঙ্গি এসে জুটেছে। আমার গান শুনে সেখানকার ফিরিঙ্গিরা কয়েক ভাঁড় দিয়েছিল। সবটা প্রাণে ধরে শেষ করতে পারি নি, আছে সঙ্গে খানিকটা। রাত একটু এগোক, চাখাব তোমায়। আচ্ছা দাদা, উঠি। এখন এক ছিলিম না পেলে জুতসই হচ্ছে না। দেখি কোথায় বাগাতে পারি।'

বৈরাগীর অনুমান মিথ্যা হইল না, রাত একটু বাড়িতেই দেখা গেল বিব্বু চুপি-চুপি বৈরাগীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। বৈরাগী প্রস্তুতই ছিল, হাসিয়া কহিল, 'এই যে দাদা! আমার তৈরিই আছে, এস।'

ঝুলি খুলিয়া বৈরাগী একটা মাঝারি আকারের বোতল বাহির করিল। এ ধরনের বোতল ফিরিঙ্গিদের কাছে ছাড়া বড়-একটা দেখা যায় না। তারপর সে বিব্বুর প্রসারিত গেলাসে তা হইতে খানিকটা উগ্র তরল পদার্থ ঢালিয়া দিল। বাস্তবিকই অত্যন্ত দামী ফরাসী মদ—বৈরাগী নেহাত বাজে কথা বলে নাই। মুহূর্তের মধ্যে গেলাস উজাড় করিয়া বিব্বু আবার হাত বাড়াইল। বৈরাগী দরাজ হাতে পুনরায় তা পূর্ণ করিয়া দিল। একবার—তু-বার—তিনবার। পাকা নেশাখোর বিব্বুরও এবার নেশা ধরিতে দেরি হইল না।

তারপর তুজনে শুরু হইল গল্প। বৈরাগী শুনাইল তার বাঁধন-হারা জীবনের অদ্ভুত ভ্রমণ-কাহিনী। বিব্বুও তার জীবনের অনেক

কাহিনী বলিয়া গেল। নিম্ন-বাংলার এ জীবন তার আর ভাল লাগিতেছে না। এই ধরনের কয়েক পিপা পানীয় পাইলেই সে আরাকানে ফিরিয়া গিয়া ঘর-সংসার পাতিবে—এই ধরনের নানা কথা।

'তা এখন চলেছ কোথায় ? নিমপুকুর ?'

বিব্বু অবাক হইয়া কহিল, 'কী করে জানলে ? আমি তো বলিনি কিছু !'

'হুঁহুঁ,' বৈরাগীর মুখে দুষ্টামির হাসি।—'বারেটো সাহেব কোথায় সাক্ষাতের জায়গা ঠিক করলেন ?—নবমীর দিন, না দশমীর দিন ?'

'তুমি তো দেখছি অনেক খবর রাখ !'

'তুমিও রাখবে দাদা ! যে জিনিস চাখলে এর গুণ তো জান না !'

'সত্যি !'—বিব্বুর মুখে সন্দেহ এবং বিস্ময় একত্রে ছায়া ফেলিল।

'সত্যি নয় তো কী ? এই দেখ না, জীবনে তোমার সঙ্গে আমার আর কখনও দেখা হয়েছে বলতে পার ? অথচ আজ তুমি আমার কত বড় বন্ধু হয়ে পড়লে। তোমার কত খবর আমি বলে দিলাম। তুমিও বলতে পারবে—অবশ্যি একদিনেই নয়।'

বিব্বুর হিংস্র চোখ হইতে সন্দেহের ছায়া ধীরে ধীরে অপসারিত হইল—সেখানে দেখা দিল অপার বিস্ময়। এবার আর সে বৈরাগীর সঙ্গে কোন বিষয়েই নিঃসঙ্কোচে আলাপ করিতে দ্বিধা বোধ করিল না।

আবার রত্নহার ২৬

সুতানুটি হইতে কয়েক ক্রোশ দক্ষিণে গঙ্গা হইতে একটি ছোট খালের মত বাহির হইয়া পুব দিকে চলিয়া গিয়াছে। দেখিতে জায়গাটা অনেকটা ফাঁড়ির মত। ফাঁড়ির মুখে দু-পাশে ঘন জঙ্গল—ছোট-বড় নানা ধরনের গাছে ভরিয়া আছে। এখানে নদীর ভাঙনও বেশি। স্রোতের বেগে মাঝে মাঝে মাটি ধ্বসিয়া গিয়া ছোট-ছোট

খাদ অথবা গহ্বরের সৃষ্টি করিয়াছে। তার দু-পাশে ঘন হোগলা-বন —হয়ত নানা জাতের বিষধর সাপের আবাসভূমি।

জায়গাটি নির্জন, আশেপাশে খুব কাছাকাছি লোকের বসতি আছে বলিয়া মনে হয় না। শুধু ঢেউয়ের একটানা ছপ্-ছপ্ শব্দ আর থাকিয়া-থাকিয়া নানা জাতের পাখির একঘেয়ে মিঠা অথবা কর্কশ আওয়াজ জায়গাটিকে জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছে। ফাঁড়ির মুখের কাছে একখানি সুসজ্জিত বজরা অপেক্ষা করিতেছিল। বজরাখানি বেশ বড়। ছাদের উপর বন্দুক হাতে পাহারারত কয়েকজন পাইক বজরার মালিকের আভিজাত্যের পরিচয় দিতেছে। বজরার সঙ্গে আরও খান-দুই ছোট নৌকা পাড়ে ভিড়ানো।

'ওহে সুজন সিং, দেখ তো দূরে কোন নৌকো-টৌকো দেখতে পাচ্ছ কি না?'

সুজন সিং একবার দূরে দিক্‌চক্রবালে সন্ধানী চক্ষু বুলাইয়া লইয়া কহিল, 'আজ্ঞে না হুজুর, এখনও তো কোন কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আমরা হুঁসিয়ার আছি।'

'হুজুর'য়ের কণ্ঠের তীব্র বিরক্তি এবার আর চাপা রহিল না। বজরার ভিতরের আর কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া সে কহিল, 'ডোবালে দেখছি! এই ফিরিঙ্গি বেটাদের কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। কী মতলবে আছে কে জানে! সব মুখোস বেটাদের,—সব মুখোস!'

ভিতর হইতে কে বলিল, 'দাঁড়ান না, আগে কাজটা গুছিয়ে নেওয়া যাক, তারপর দেখা যাবে ফিরিঙ্গিরা ক-দিন ব্যবসা চালায়! সেদিন আপনি ঠিকই বলেছিলেন—শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। বুনো ওলের সঙ্গে বাঘা তেঁতুল ছাড়া আর কী দাওয়াই আছে?'

বজরার মালিক আর কেহ নয়, চাঁদপাল। পাদ্রি বারেটোর সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য আজ এই জায়গাটিই নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে, বারেটোর দেখা নাই। চাঁদপাল কয়েকজন বিশ্বস্ত সঙ্গী লইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছে, বিরক্ত

হইবার কথাই তো!

সহসা উপর হইতে সুজন সিংয়ের সাড়া পাওয়া গেল। ঐ দূরে কালো মত একটি বিন্দু যেন এদিকে আগাইয়া আসিতেছে!

একটু পরেই অনুমান সত্য বলিয়া বুঝা গেল। একখানি ছিপ গঙ্গার জল কাটিয়া তীরবেগে আগাইয়া আসিতেছে। ফিরিঙ্গির ছিপ না হইলে কি এত বেগে আসিতে পারে!

খানিকক্ষণের মধ্যে ছিপ আসিয়া বজরার পাশে দাঁড়াইল। কয়েকজন পর্তুগিজ সৈন্য চটপট বজরার উপর লাফাইয়া পড়িল। তাদের পিছন-পিছন প্রৌঢ় পাদ্রি বারেটোও নামিলেন। চাঁদপাল আগেই বজরার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। নিজে পরিচয় করাইয়া দিল।

বারেটো চাঁদপালের পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন, 'আমি সব শুনেছি। সুবেদার সাহেবকে খুব জব্দ করেছেন। বেটা আমাদের পেছনেও লেগেছিল।'

চাঁদপাল কৃতার্থের হাসি হাসিয়া কহিল, 'সে তো আপনারই জন্য সম্ভব হয়েছে।'

এবারে কথা বলিল 'বাবু'। কহিল, 'যা বলেছেন! যে অদ্ভুত জিনিস ওঁকে দিয়েছিলেন ও কি টাকায় কেনা যায়? কত দিনের—কত পরিশ্রমের ফল ও! তা ধন্যি আপনার ওষুধবিষুধের জ্ঞান বলতে হবে! আচ্ছা, সুবেদার সাহেবের হাতে জিনিসটা পড়ল কী করে—আমি তো আজও বুঝতে পারছি না!'

বারেটোই জবাব দিলেন। চাঁদপালকে দেখাইয়া কহিলেন, 'এখন আর তোমাদের কাছে বলতে বাধা নেই, ওঁর সঙ্গে আমার কথা ছিল এমন একটা অদ্ভুত কিছু জোগাড় করে দিতে হবে যা দিয়ে সুবেদার সাহেবকে ভয় দেখিয়ে চাপ দিয়ে ঘায়েল করা যায়। অবশ্যি ওর জন্য উনি উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে রাজি ছিলেন। ভাবলাম এ দেশে ব্যবসা করতেই যখন আসা তখন আপত্তি কিসের! এও

তো ব্যবসারই সামিল! কিন্তু কী দেওয়া যায়! শেষে মনে পড়ল, চিকিৎসা ব্যাপারে নানা ওষুধবিষুধ ঘাঁটতে ঘাঁটতে এমন কয়েকটা ব্যারামের বিষ আমার জানা হয়ে গেছে যা যে-কোন জায়গায় ফেললে সেখানে মুহূর্তের মধ্যে মহামারী ছড়িয়ে দেওয়া যায়। আর সে এমন ব্যারাম যা শুধু আমাদের ঐ পশ্চিমের দেশেই দেখা যায়—এ দেশের লোকে তার নামও শোনে নি। ভাবলাম এইরকম কিছু বিষ পাঠিয়ে দেওয়া যাক! বিষ তৈরি করলাম, কিন্তু তারপরেই বাধল একটু গোল। গোয়ার গভর্নর, আমার বিশেষ বন্ধু, হঠাৎ গেলেন চলে, তার জায়গায় নতুন যে লোকটা এল সে বেটা এক ধর্মপুত্তুর। বলে কিনা উচিত কথা, ছাড় দিয়ে—সব ছেড়ে দাও, সহজ ভাবে দেশী লোকেদের সঙ্গে কারবার শুরু কর। আরে মোলো, তার মানে খোলাখুলি লোকসান দিয়ে ব্যবসা! লোক দেখে গেল বেটা উল্টো খেলা শুরু করল এখানে। কী করব, খোদ সম্রাট পাঠিয়েছেন, না বলতে পারি না। কোথা থেকে নতুন ঝামেলা মাথায় এল!'

একটু থামিয়া বারেটো বার-কয়েক দাড়িতে হাত বুলাইয়া লইলেন। তারপর আবার শুরু করিলেন—'তা, ভাবলাম এক কাজ করা যাক—দেশ থেকে ব্যবসার ব্যাপারে কয়েকটা অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু এসেছিল—কথা ছিল খুব বড়-বড় রাজা-উজিরদের কাছে চড়া দামে সেগুলো ছাড়তে হবে। ভাবলাম ওরকম সাজানো নেই—সাধারণ লোকে তো আর ওর ধারে-কাছে পৌঁছতে পারবে না! ঐ ধরনের একটি মাল'—চাঁদপালের দিকে চাহিয়া কহিলেন, 'যেন ওর কাছে পাঠাচ্ছি—বিক্রির জন্য। আর সেই দামী মালের মধ্যে ভরে দিলাম সেই বিষ। মালটির গায়ে চিহ্ন দিয়ে ব্যাপারীদের বলে দিলাম,—'এ মাল চাঁদপাল সাহেবের ফরমাসি মাল; যেন আর কাউকে বেচিস নে। চার-পাঁচটা এক ধরনের মালের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে যা।'—অর্থাৎ যেন কেউ সন্দেহ না করতে পারে। বুঝলি না?

'কিন্তু এমনই কপাল, পথের মধ্যে কোন্ চটিতে বাবুরা বসলেন বিশ্রাম করতে, আর সেখানে এল ঐ বারোদীঘির জমিদারবাবুর কোন্ আত্মীয়। মালা দেখে লোকটা তো তাজ্জব বনে গেল। তখনই গেল জমিদারের কাছে। আর সে বেটাও আর তিলমাত্র দেরি না করে একগাদা মোহর এনে ওটাকে কিনে ফেলল—তার শখের পুতুলের গলায় নাকি পরাবে! আমার লোকগুলোও এমনি হাঁদা, তাড়াতাড়িতে সেই চিহ্ন-ওয়ালা মালাটিই—যা চাঁদপাল সাহেবকে দিতে বলেছিলাম,—সেইটিই দিলে বার করে।

'ভুল ধরা পড়ল কয়েকদিন পরেই। কিন্তু তখন নাকি বারোদীঘির জমিদারবাবু কিসব মন্ত্রতন্ত্র পড়ে সে মালা পুতুলের গলায় চাপিয়ে দিয়েছে, খুলে নেওয়া নাকি এই পৌত্তলিকদের মতে ভীষণ পাপ! কী আর করি, পাছে সন্দেহ করে তাই ভাবলাম, গায়ের জোরে বন্দুকের খোঁচায় ওটা কেড়ে আনা যাক। কিন্তু তা করতে গিয়ে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল—সেই ভুতুড়ে তীরের কথাই বলছি।—বিব্বু, তুমি তো নিজেই ছিলে হে!'

বিব্বু ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'হ্যাঁ, সেই ভুতুড়ে তীর না এলে অত হাঙ্গামা করে, শেখরেশ্বরকে ভাঁওতা দিয়ে মালা নিতে হত না। যাক গে, সে মালা তো শেষপর্যন্ত যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া গেছে!'

'তা মশাই, কী যেন জানতে চেয়েছিলেন রত্নহার সম্বন্ধে?'

চাঁদপাল ধীরভাবে সমস্ত শুনিতেছিল, কহিল, 'হ্যাঁ, আপনার পরামর্শ-মত মালার সরু মটরগুলো একটা করে খুলে যে যে গ্রামে ভাঙতে বলেছি সেখানেই আপনাদের অদ্ভুত ব্যারাম ছড়িয়ে পড়েছে। দশ বারোটা মটর-দানা গেছে। কিন্তু আপনি মাঝের ত্রিশূল-আঁকা দানাটা খুলতে বারণ করেছিলেন। সেইটে সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলাম।'

'ও! ওটা দেওয়ার কিছু উদ্দেশ্য ছিল না—নেহাত বিপদে পড়লে যাতে একটা সুরাহা হয় তারই জন্য ওটা দেওয়া। ওটার

বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, ওটা ফুটো করে তার ওপর জোরে আঘাত করলে এক রকম বিষাক্ত ধোঁয়া শব্দ করে বেরিয়ে আসে আর আশ-পাশের সব কিছু ধ্বংস করে ফেলে। তাই ওটা সম্বন্ধে সাবধান হতে বলেছিলাম—আর ভাঙতে নিষেধ করে দিয়েছিলাম। আগে বলি নি—কখন কোন্ আনাড়ি কী কাণ্ড বাধিয়ে বসবে! বের করুন না মালাটা, দেখিয়ে দিচ্ছি। সঙ্গে এনেছেন তো?'

চাঁদপাল ঘাড় নাড়িল; তারপর একটু ইতস্তত করিয়া জামার ভিতর হইতে সেই মহামূল্য রত্নহারটি টানিয়া বাহির করিল। মালাটি আর তত বড় নাই, কিন্তু তার ঔজ্জ্বল্য কিছুমাত্র ম্লান হয় নাই। মাঝখানের সবচেয়ে বড় দানাটির গায়ে নিপুণ হাতে আঁকা একটি ত্রিশূল চিহ্ন তখনও জ্বল্-জ্বল্ করিতেছে। কার সাধ্য বুঝিতে পারে ইহার মধ্যে কী ভয়ঙ্কর পদার্থ ভরা রহিয়াছে!

বিব্বু তারিফ করিয়া কহিল, 'অদ্ভুত আপনার ক্ষমতা যা-হোক!'

বারেটো হাসিয়া কহিলেন, 'আচ্ছা, এবারে আসল কথা শুরু হোক। কিন্তু তার আগে, রোস, শুভ আলোচনার আগে—মেনেলাস, বড় বোতলটা এদিকে নিয়ে এস তো,—আর কয়েকটা গেলাস।'

বোতল আসিল, গেলাস সফেন তরল পদার্থে কানায় কানায় পূর্ণ হইল, এবং একটু পরেই বারেটোর দীর্ঘ শ্মশ্রু বাহিয়া সেই ফেনিল রস গড়াইয়া বজরার পাটাতন ভিজাইয়া দিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে অনতিদূরে হোগলা বন ঈষৎ নড়িয়া উঠিল। পলকের জন্য মনে হইল, একটা কালো জেলে-ডিঙি বা ঐ ধরনের কিছুর উপর একটি দীর্ঘ দেহ যেন জলের তলা হইতে মাথা গলাইয়া ভাসিয়া উঠিয়াছে। পরক্ষণেই আচমকা শিলাবৃষ্টির মত ঝাঁকে-ঝাঁকে তীর আসিয়া বজরার উপর পড়িতে লাগিল—সেই ভুতুড়ে তীর।

ব্যাপারটা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিবার আগেই একটি তীর আসিয়া চাঁদপালের হাতে, একেবারে সেই রত্নহারের উপর গিয়া

পড়িল। প্রায় বজ্রপাতের মতই বিকট একটি শব্দ! পরক্ষণেই রাশি-রাশি কালো ধোঁয়ার আড়ালে বজরা ও ছিপ তার সমুদয় আরোহী-সহ গঙ্গার অতল গর্ভে ডুবিয়া গেল।

তীরন্দাজ কোথায় গেল ২৭

সংসারে কোন খবর চাপা থাকে না। গঙ্গাগর্ভের দুর্ঘটনা, আবার ভুতুড়ে তীরের উৎপাত এবং সেইসঙ্গে ফ্রান্সিস্কো বারেটো ও চাঁদপাল প্রভৃতির সলিল-সমাধির সংবাদও অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সবত্র ছড়াইয়া পড়িল। বজরার সঙ্গে যে দু-খানি ছোট নৌকা ছিল তারই একখানি দৈবক্রমে রেহাই পাইয়া গিয়াছিল। সে নৌকায় ছিল চাঁদপালের দুইজন বরকন্দাজ। কোন রকমে পালাইয়া আসিয়া তারাই ঘটনাটি রাষ্ট্র করিয়া দিল। রত্নহারের রহস্যও তারাই প্রকাশ করিয়া দিল, কিন্তু অপর রহস্যের সমাধান করিতে পারিল না। ভুতুড়ে তীরের কাণ্ডই শুধু জানা গেল—তীরন্দাজের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

বারেটোর মৃত্যুতে পর্তুগিজ দল মুষড়াইয়া পড়িল। ডিমেলো অ্যাডমিরাল হিসাবে দলের নেতৃস্থানীয় হইলেও বারেটোই ছিল তাদের প্রাণ। পাণ্ডিত্য, চিকিৎসা-বিজ্ঞান দল পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে তার ছিল যেমন অদ্ভুত ক্ষমতা, তেমনি শঠতা কূটবুদ্ধি এবং অত্যাচার ইত্যাদি ব্যাপারেও তার সমকক্ষ কেহ ছিল না। কেন যে সে অন্য সব পথ ছাড়িয়া ধর্মযাজকের পদ বাছিয়া লইয়াছিল বলা কঠিন। হয়ত উহারই আড়ালে প্রতিপত্তি বিস্তারের সুযোগ জুটিত বেশি। সে যুগের পর্তুগিজ পাদ্রিদের মধ্যে এই ধরনের নৃশংস লোক আরও ছিল, ইতিহাস আজও তার সাক্ষ্য দিতেছে। নিরীহ বিদেশীদের উপর তারা যে অমানুষিক শারীরিক ও মানসিক উৎপীড়ন চালাইত—সে কলঙ্ক-কাহিনী ইতিহাসের পাতা হইতে কোনদিনই

হয়ত মুছিবে না। ধর্মের প্রচারের জন্য তারা নিযুক্ত হইত, আর নিজেদের ব্যবহারের প্রতিটি পদে ঠিক তার বিপরীত রূপই তারা দেখাইত।

বারেটোকে হারাইয়া পর্তুগিজ দলে তাই শুধু ভাঙনই ধরিল না, ভয়ও দেখা দিল প্রচুর। ফলে গোটা দলটার মধ্যেই একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। শৃঙ্খলাহীন দল, তা সে যত শক্তিশালীই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত কোন কাজেই আসে না। বারেটোর জায়গায় ঐ অঞ্চলের নেতৃহীন ফিরিঙ্গিদের পরিচালনা করিতে পারে এমন কেউই ছিল না—ফলে কিছুদিনের জন্য নিম্নবঙ্গে পর্তুগিজ প্রতিপত্তি অনেকখানি হ্রাস পাইল। পর্তুগিজরা সপ্তগ্রাম ছাড়িয়া হুগলী ও ফিরিঙ্গির চকেই আশ্রয় লইল। পূর্ব-পরিকল্পনা মত আক্রমণ করা দূরে থাক, এই নতুন ব্যাপারের প্রতিশোধ লইবার মত সাহসও যেন তাদের মধ্যে আর রহিল না।

ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটিল। আগেই বলিয়াছি, ফালাগ্রিজ সাহেব—যিনি গোয়ার নতুন পর্তুগিজ শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন—তিনি লোকটি ছিলেন কতকটা নিরীহ। পর্তুগিজদের অতটা দস্যুবৃত্তি তাঁর ভাল লাগিত না। সহজভাবে—বন্ধুভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে নজর দেওয়াই ছিল তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু পর্তুগিজরা তখন দস্যুবৃত্তিতে এতটা অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে সে নির্দেশ, শাসনকর্তার হইলেও, মানিতে চাহিত না। ফালাগ্রিজ চেষ্টা করিয়াও তাদের স্বমতে আনিতে পারেন নাই। তা ছাড়া সুদূর নিম্নবঙ্গে বারেটোর প্রতিপত্তির কথাও তাঁর অজানা ছিল না। তাই বারেটোর কার্যকলাপ পছন্দ না করিলেও তিনি তাহাকে ঘাঁটাইতে সাহস পান নাই। বারেটোর মৃত্যুর পর তিনি এদিকটা নতুন ভাবে গড়িবার চেষ্টা করিলেন—হুগলীর কাছেও তদনুরূপ নির্দেশ আসিল। এমনকি গোয়া হইতে ইব্রাহিম খাঁর কাছেও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি লইয়া দূত আসিল। মনে হইল হয়ত বা বাংলা হইতে পর্তুগিজ-ভীতি অদৃশ্যই হইল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয় নাই। ফার্নাণ্ডিজের পক্ষে বেশিদিন ভারতবর্ষে থাকা সম্ভব হয় নাই; হয়ত বা ভিন্ন মতাবলম্বী পর্তুগিজদেরই চক্রান্তে। তাঁর নীতিতে অন্তত সাময়িকভাবেও পর্তুগাল রাজ-সরকারের আয় কমিয়া যাওয়া স্বাভাবিক। ফার্নাণ্ডিজের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরেই আবার বাংলায় পর্তুগিজদের স্বমূর্তি জাগিয়া উঠে। তাদের দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে। কারণ ফার্নাণ্ডিজের মত দূরদর্শী লোক বেশি থাকিলে বোধহয় অত তাড়াতাড়ি তাদের এ দেশ হইতে পাততাড়ি গুটাইতে হইত না।

এদিকে চাঁদপালের মৃত্যুসংবাদেও কম সোরগোল পড়িল না। দেশের বেশির ভাগ লোকই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ক্ষুদে হইলে কী হয়, শয়তান হিসাবে চাঁদপালও বড় কম ছিল না।

চাঁদপালের দলেও ভাঙন দেখা দিল। যেসব ছোটখাট জমিদার সুযোগ বুঝিয়া চাঁদপালের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল তাদের মধ্যে কেহ-কেহ গা ঢাকা দিল, কেহ বা বেগতিক দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিল। নবাবের ফৌজ সহজেই নিমপুকুর দখল করিয়া লইল।

চন্দনারও সেই অবস্থা। চন্দনাও যে চাঁদপালের সঙ্গে জুটিয়াছিল, সে খবর চাপা থাকিবার কথা নয়। এ ব্যাপারে যার আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি, সেই রাসবিহারীর অবস্থাই হইল সবচেয়ে গুরুতর।

বেলা তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। চন্দনার জমিদার-বাড়ির দরজায় রাসবিহারী খুব উত্তেজিত অবস্থায় পায়চারি করিতেছিল। আজ তিন দিন ধরিয়া সে ক্রমাগত হাঁটাহাঁটি করিতেছে—কিন্তু তরুণ জমিদারের সাক্ষাৎ পায় নাই। নন্দ চৌধুরী নাকি দরজায় খিল দিয়া পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছে। খাওয়ার সময় হইলে একবার উঠে, কিন্তু কাহারও সঙ্গে দেখা করে না। খাওয়ার পর আবার বিছানায় গা ঢালিয়া দেয়। কী নেশা করে ভগবান জানেন। নেশা না করিলে সুস্থ মানুষের পক্ষে কি এরকম সম্ভব? অবশ্য ব্যাপারটা

নতুন নয়, নন্দ চৌধুরীর এ অভ্যাস অনেক দিনের। এইভাবে দরজা আঁটিয়া, বাহিরের জগৎকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া, দিনের পর দিন বিশ্রাম সে ইতিপূর্বে আরও অনেকবার লইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া এই ভীষণ বিপদের দিনেও কি কেউ অমনভাবে ঘুমাইতে পারে? রাসবিহারীর ইচ্ছা হইতেছিল, দরজা ভাঙিয়া সে এই অপদার্থ জমিদারপুত্রকে হিড়-হিড় করিয়া টানিয়া বাহির করে! সহ্যের সীমা তার প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল।

'ওহে, বলি তোমাদের কত্তামশাই কি আজও উঠবেন না? দেখ তো আর-একবার গিয়ে! বাইরে একটা পটকা-টটকা ফাটাও না, আওয়াজে যদি কাজ হয়!'—নন্দ চৌধুরীর খাস ভৃত্য রামচরণকে লক্ষ্য করিয়া অসহিষ্ণু রাসবিহারী চেঁচাইয়া কহিল। রামচরণ কন্দর্প চৌধুরীর আমলের ভৃত্য, রাসবিহারীকে সে ছোট হইতে জানে; কহিল, 'বসুন, বসুন। আজ দুপুরে উঠে খেতে বসেছিলেন, তখন বলেছি আপনার কথা। আজ বিকেলে দেখা হবে বলেছেন।'

'তোমার বিকেলের তো ভারি বাকি আছে! সন্ধে পার হতে চলল, তার—'

সহসা ভিতরে দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল—এবং একটু পরেই হাই তুলিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে নন্দ চৌধুরী বাহির হইয়া আসিল। রাসবিহারীকে দেখিয়া কহিল, 'এই যে, কী ব্যাপার? সক্কাল বেলা উঠেই যে!'

'সকাল!' রাসবিহারীর স্বরে গভীর ক্ষোভ, 'একবার আকাশের দিকে চেয়ে দেখুন না!'

নন্দ একবার ভ্রূকুটি করিয়া পশ্চিম আকাশে তাকাইল। হাসিয়া কহিল, 'ও, দিনটা মেঘলা বলে আর সময় খেয়াল করতে পারি নি। তা এস, ঘরে এস। খবর কী?'

'খবর অত্যন্ত গুরুতর। শোনেন নি কিছু?' রাসবিহারী নন্দর পিছু-পিছু বসিবার ঘরে ঢুকিল, তারপর এক-এক করিয়া সমস্ত

ব্যাপার খুলিয়া জানাইল। 'এখন উপায় ?'

এতক্ষণ পরে এইবার নন্দ চৌধুরীর মুখেও গভীর চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল। বাস্তবিকই, উপায় কী ?

'আমার মনে হয়'—রাসবিহারী বলিল, 'আমাদেরও দেরি না করে গা-ঢাকা দেওয়া উচিত। এ জমিদারি আর থাকবে না—নবাব খাস করে নেবেই ; তবু যদি প্রাণটা রক্ষা পায়।'

নন্দ চৌধুরী কি যেন চিন্তা করিতেছিল, একটু থামিয়া কহিল, 'কোথায় যেতে চাও ?'

'সে যা-হয় একটা ঠিক করা যাবে। আওলাতগঞ্জ আর শুক-দ্বীপের ওরাও যাচ্ছে, ওদের সঙ্গে যোগ দেওয়া যেতে পারে। আপাতত কিছুদিন দক্ষিণের কোন জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে থাকা যাক। তারপর দরকার হলে কিছুদিন গৌড় বঙ্গ ছেড়েও যাওয়া যেতে পারবে। নইলে, বুঝছেন না, ওদিকে আবার মৃগাঙ্ক রায়ের দল ক্ষেপে আছে, সুযোগ বুঝে পেছনে লাগতে দেরি করবে না। তিন পুরুষের শত্রু যে ?'

নন্দ চৌধুরী চট করিয়া জবাব দিল না। মনে হইল প্রস্তাবটা তার খুব পছন্দ হইতেছে না। আবার খানিকক্ষণ কি ভাবিয়া কহিল, 'আর, যদি অন্য সবাইকার মত আত্মসমর্পণ করা যায় ?'

'তাহলে হয় প্রাণদণ্ড নয় তো আজীবন কারাবাস।'

'সে বরঞ্চ প্রথমটার চাইতে ভাল...'

'আপনি তো তা বলবেনই ! ভাবছেন কারাগারে পুরলে আর কী, সময়-মত খাওয়া আর দিনের পর দিন তোফা ঘুম। কিন্তু নবাবের কারাগার অত সহজ জিনিস নয় ! বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করবার জন্যই তার সৃষ্টি। মাটির তলায় সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন সে এক ভয়ঙ্কর নরককুণ্ড। ভগবান করুন, শত্রুরও যেন তা দেখতে না হয় !'

'কিন্তু তোমাদের জন্যই তো এ কাণ্ডটা হল। আমি তো চুপচাপ

থাকতেই চেয়েছিলাম, তুমিই তো জোর করে চাঁদপালের কাছে গিয়ে কথা পাড়লে। যাক, যা হবার হবে। কী করা যায় ভেবে দেখব-খন।'—নন্দ চৌধুরী নাকে একটিপ নস্য গুঁজিয়া তাকিয়া টানিয়া ভাল করিয়া হেলান দিয়া শুইল।

রাসবিহারী বিড়-বিড় করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মনে মনে বলিল, 'এখনও ভেবে দেখব! ঐ ভাবতে ভাবতেই তোমার মরণ ঘনিয়ে আসবে! নাঃ, এ অপদার্থের সঙ্গে আর নয়, আজই রাত্রে আওলাতগঞ্জের ওদের কাছে রওনা হতে হবে।'

এইবার সুবেদার ইব্রাহিম খাঁর একটু খোঁজ নেওয়া দরকার। এত বড় একটা ব্যাপার হইতে যে এমন অভাবনীয় ভাবে উদ্ধার পাওয়া যাইবে, তা তিনি কল্পনায়ও আনিতে পারেন নাই। বিস্ময় এবং আনন্দের প্রথম ধাক্কাটা কাটিলে পর স্বভাবতই প্রশ্ন জাগিল — এমন অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হইল কী করিয়া! কে এই অদৃশ্য তীরন্দাজ?

নবাব চারিদিকে ঘোষণা করিয়া দিলেন — এই তীরন্দাজের সন্ধান চাই। এমন উপযুক্ত লোককে খুঁজিয়া পুরস্কৃত করিতে না পারিলে তার রাজ্যশাসনের সম্মান থাকে না যে! ঘোষণায় আরও বলা হইল, কেহ এই তীরন্দাজের সম্বন্ধে কোন সঠিক খবর দিতে পারিলে তাহাকেও উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে।

কয়েক মাস কোনদিক হইতেই কোন সাড়া আসিল না। তীরন্দাজ নিজে তো পরিচয় দিলই না, অন্য কেহও তার সন্ধান দিতে আগাইয়া আসিল না।

তারপর ঘটিল আর এক অভাবনীয় ঘটনা। সপ্তগ্রামের ফৌজদার কি কাজে সদলবলে সুতানুটির আশপাশে টহল করিয়া ফিরিতে-ছিলেন, তাঁহারই লোকেরা একদিন এক বুড়া জেলেকে ধরিয়া আনিল। জেলে তাদের এক অদ্ভুত গল্প শুনাইয়াছে। ফৌজদার জেলেকে জেরা

করিয়া যা জানিলেন তার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই : প্রায় মাসতিনেক আগে একদিন জেলে আর তার ছেলে মাছ ধরিবার জন্য কয়েক ক্রোশ দক্ষিণে সোনারবালিয়া ফাঁড়ির কাছে একটা ছোট খাল দিয়া নৌকা করিয়া আসিতেছিল। গঙ্গার কাছাকাছি আসিতেই একটা ছপ-ছপ্ আওয়াজ শুনিয়া চাহিয়া দেখে, একখানা ছিপ তীব্র বেগে জল কাটিয়া আগাইয়া আসিতেছে। ছিপের আকৃতি আর গতি দেখিয়াই তারা বুঝিতে পারে, এ ছিপ ফিরিঙ্গির ছাড়া আর কাহারও নয়। ভয়ে তাড়াতাড়ি তারা পাশের একটা হোগলা-বনের মধ্যে নৌকা ঢুকাইয়া আত্মগোপন করে। ঠিক সেই সময়ে তাদের নজরে পড়ে, অদূরে আর একটি খাদের ভিতর আর একখানা জেলে-ডিঙি তাদেরই মত হোগলা-বনে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে। দুরন্ত ফিরিঙ্গির ভয়ে এভাবে আত্মগোপনের চেষ্টার মধ্যে বিস্ময়ের কিছুই নাই —কিন্তু তারা বিস্মিত হয় নৌকার আরোহীকে দেখিয়া। ও অঞ্চলের অনেকেই তাঁকে চেনে। সবাই তাঁকে ফকির সাহেব বলিয়া ডাকে। সেই পাগড়ি, সেই লম্বা দাড়ি, সেই পরিচিত আলখাল্লা—চিনিতে পিতাপুত্রের কারোই ভুল হয় নাই। কিন্তু তার চেয়েও বিস্ময়কর ছিল ফকির সাহেবের দেহসজ্জা। পিঠে তীরভরা তূণ, কাঁধে ঝুলানো দীর্ঘ ধনুক—ফকির সাহেবের এ যোদ্ধ্বেশ তারা এর আগে কল্পনাও করিতে পারে নাই। তারা তাঁকে নির্বিরোধ, পরোপকারী, হাস্যমুখ একজন মুসলমান সন্ন্যাসী বলিয়াই জানিত। কিন্তু আজ তাঁর এ কী মূর্তি! ফকির সাহেব তাদেরই মত লগি ঠেলিয়া ডিঙিটাকে ভিতরে লুকাইবার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন, তাই তাদের লক্ষ্য করেন নাই।

তারপর আর-এক কাণ্ড। ছিপ আসিয়া কেন যেন অদূরে থামিয়া যায়—চোখে না দেখিলেও দাঁড়ের ছপ্-ছপ্ শব্দ হঠাৎ থামিয়া যাওয়ায় বুঝিতে কষ্ট হয় না। জেলে ও তার ছেলে রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রতিটি মুহূর্ত গণিতে থাকে; নিশ্চয়ই ফিরিঙ্গিরা তাদের

দেখিতে পাইয়াছে, নহিলে এমন অসময়ে এই জঙ্গলে আঘাটায় ছিপ থামাইবে কেন? কিন্তু সেও বেশিক্ষণের জন্য নয়; অল্পক্ষণ পরেই, বারুদে আগুন দিলে যে-রকম বিস্ফোরণের শব্দ হয় তেমনি এক বিকট শব্দে তারা চমকাইয়া ওঠে—এবং দেখিতে দেখিতে ঘন কালো ধোঁয়ায় জায়গাটি আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। বেগতিক দেখিয়া পিতাপুত্রে কোনও রকমে নৌকা টানিয়া খাল দিয়া পিছু ফিরিয়া আত্মরক্ষা করে। ফকির সাহেবের কোন খোঁজ লইবার সময় বা সাহস তাদের হয় নাই। তবে সেই হইতে ফকির সাহেবকে এ অঞ্চলে আর কেহ দেখে নাই।

জেলের বিবরণ শুনিয়া ফৌজদার যেন এক নতুন আলোর সন্ধান পাইলেন। ফকির সাহেব! নামটা যেন তিনিও দু-একবার কোথায় শুনিয়াছেন। নাম যখন পাওয়া গিয়াছে তখন লোকটিরও সন্ধান অবশ্যই পাওয়া যাইবে। নবাব তাকে বন্ধুরূপে চান, কেন সে ধরা দিবে না?

অবশেষে • ২৮

অবশেষে ফৌজদারের চেষ্টা সফল হইল। এনায়েৎ খাঁ তাঁর সঙ্গে জুটিলেন। প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় পাঁতি-পাঁতি করিয়া নানা স্থান খুঁজিয়া শেষে শোনা গেল, শ্যামলাইয়ের দত্তজা মশাই ফকির সাহেবের পরম বন্ধু। তাঁদের বাড়িতে ফকিরকে অনেকবার দেখা গিয়াছে। এনায়েৎ খাঁ ফৌজদারকে সঙ্গে লইয়া শ্যামলাই গিয়া হাজির হইলেন। দত্তজাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতেই তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন, যে-ভাবেই হোক ফকির সাহেবকে তিনি নবাবের কাছে পাঠাইতে পারিবেন।

ইব্রাহিম খাঁর যেন আর তর সহিতেছিল না। জাহাঙ্গিরনগরে বসিয়া থাকিতে আর তাঁর ভাল লাগিতেছিল না—তিনি খবর

পাঠাইলেন, একবার দক্ষিণ বঙ্গটা সফর করিয়া বেড়াইবেন। সপ্তগ্রামেও বহুদিন যান নাই, সেখানেও আসিবেন। ঐ সময়ে সপ্তগ্রামে তিনি একটি দরবার বসাইতে চান। ফৌজদার যেন অবিলম্বে তার সকল ব্যবস্থা করেন এবং ঐ দরবারে যেন ফকির সাহেবকে শ্যামলাই-য়ের দত্তজা মারফৎ অবশ্য অবশ্য আমন্ত্রণ করা হয়।

ফৌজদার খবর পাঠাইলেন, নবাবের আদেশ পালন করা হইয়াছে—এবং ফকির সাহেবও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া দত্তজা মারফৎ সংবাদ দিয়াছেন।

দরবারের কথা সর্বত্র রাষ্ট্র হইয়া গেল। আশপাশের সম্ভ্রান্ত সকল লোককেই নিমন্ত্রণ করা হইল। সবাই শুনিল, ফকির সাহেবকে এই দরবারে পুরস্কৃত করা হইবে। ফকিরকে দেখিবার জন্য দলে-দলে লোক সপ্তগ্রামের দিকে রওনা হইল। ফিরিঙ্গির অত্যাচারে উৎপীড়িত সপ্তগ্রাম বন্দর আবার বহুদিন পরে মুখর হাসিতে ভরিয়া উঠিল।

বারোদীঘিতেও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। রাধামাধবের রত্নহারের পরিণামের কথা মৃগাঙ্ক রায়ও শুনিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য খবরটিতে তিনি খুব খুশি হইতে পারেন নাই, কিন্তু কয়েক মাস পরে নতুন এক ব্যাপারে তিনি কিছুটা তৃপ্তিলাভ করিলেন। অন্যান্য খবরের মত রাধামাধবের রত্নহারটির কথাও গোয়ার শাসনকর্তা ফার্নাণ্ডিজ-এর কানে গিয়াছিল। বারেটোর মৃত্যুর পর তিনি ডি'মেলোকে নির্দেশ দিয়াছিলেন, যেন অবিলম্বে ঐরূপ আর-এক ছড়া হার মৃগাঙ্ক রায়ের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ডি'মেলো উপরওয়ালার আদেশ অমান্য করিতে পারেন নাই। কয়েকদিন হইল ঐরূপ একছড়া নূতন রত্নহার মৃগাঙ্ক রায়ের হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এবং মৃগাঙ্ক রায় আগের বারের মতই সমারোহ করিয়া সেটি দেবতাকে নিবেদন করিবার আয়োজনে লাগিয়া গিয়াছেন। দিন-কুড়ি পরে আগামী পূর্ণিমায় সেই উৎসব। বারোদীঘির প্রজারা আবার নতুন করিয়া মাতিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু তার আগে সুবেদারের এ নিমন্ত্রণও তুচ্ছ করিবার নয়। যে ফকির সাহেব তাঁর একমাত্র পুত্রকে মৃত্যুর মুখ হইতে—হ্যাঁ, মৃত্যুর মুখ হইতেই—উদ্ধার করিয়াছেন তাঁর সঙ্গে একবার পরিচিত হওয়া—তাঁকে ধন্যবাদ জানানো—এ সুযোগ কি মৃগাঙ্ক রায় ছাড়িয়া দিতে পারেন! দু-একদিনের মধ্যেই যাত্রার আয়োজন হইয়াছে। জয়ন্ত তো সঙ্গে যাইবেই, সুশ্বেতাও ছাড়িবে না। সেই কোন্ ছেলেবেলায় সে একবার সপ্তগ্রাম দেখিয়াছিল, তা কি ছাই মনে আছে? আর তা ছাড়া এত বড় একটা দরবার—এ তো আর তোমার জন্য যখন-তখন হইতেছে না! আর ফকির সাহেবের মত একজন লোককে দেখা যাইবে—সে-ই কি কম কথা! এরা ছাড়া রসরাজ এবং আরও কয়েকজন আত্মীয়-বন্ধু সঙ্গে যাইবেন।

দেখিতে দেখিতে দরবারের দিন আসিয়া পড়িল। সপ্তগ্রামকে যেন আজ আর চেনা যায় না। এমনিতেই তার পথঘাট সর্বদা লোকজনে থই-থই করে, এখন উৎসব উপলক্ষে নূতন লোকে রাস্তাঘাট যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে। তাদের নানারকম রং-চঙে পোশাকে পথের বাহার যেন আরও অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। বহু লোক নগরে আশ্রয় জোগাড় করিতে পারে নাই, তারা নদীতে নৌকায় আশ্রয় নিয়াছে। হাজার রকম ছোট-বড় নৌকায়, বজরায় সরস্বতীর জল প্রায় ঢাকা পড়িবার জোগাড়!

নদীর ধারে প্রশস্ত ময়দানে বিরাট দরবার-মণ্ডপ। লতায়, ফুলে, রঙিন কাপড়ের ঝালরে সাজানো সে যেন এক ছোটখাট ইন্দ্রসভা। সুবেদার ইব্রাহিম খাঁও আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ফকির সাহেবও নাকি আসিয়াছেন।

সভা লোকে লোকারণ্য। মাঝখানে সুবেদারের জন্য মখমলের সিংহাসন পাতা। তারই অনতিদূরে সম্ভ্রান্ত অতিথিদের জন্য আসন নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। মৃগাঙ্ক রায় প্রভৃতি এখানেই বসিয়াছেন। মেয়েদের জন্যও পিছনে আসন নির্দিষ্ট রহিয়াছে।

কিন্তু সুশ্বেতা সেখানে বসিতে রাজি হয় নাই। পর্দার আড়াল হইতে কি আর ভাল করিয়া দেখা যায়! সেও বাপের আর জয়ন্তর গা ঘেঁষিয়া বসিয়াছে, এবং ভাইবোনে ফিসফিস করিয়া উপস্থিত অতিথিবর্গ সম্বন্ধে নানারকম সমালোচনা—টিপ্পনি কাটা শুরু করিয়া দিয়াছে।

সুশ্বেতা চারিদিক চাহিয়া কহিল, 'কই, তোদের চন্দনার জমিদার-রত্ন কোন্‌টি?

জয়ন্ত চারিদিকে ভাল করিয়া চোখ বুলাইয়া কহিল, 'কই, তাকে দেখছি না তো! এলে তো কাছাকাছিই বসা উচিত ছিল।'

'এমন একটা ব্যাপারেও আসবে না? আচ্ছা কুড়ে তো! নিমন্ত্রণ নিশ্চয়ই পেয়েছে?'

'পাওয়া তো উচিত; কিন্তু, দাঁড়া, ও তো শেষটায় চাঁদপালের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল না—নবাবের শত্রুপক্ষে? তবে কি আর আসতে সাহস পাবে? হয়ত জমিদারি ছেড়ে কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে!'

সুশ্বেতা হাসিয়া কহিল, 'না,তাও নয়। তাতেও একটু নড়তে-চড়তে হয়। ও বোধহয় ধরা দিয়ে এখন নবাবের আতুর-আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু তুই এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছিস? সে তো তোরই বন্ধু। এক সময় তো লুকিয়ে-লুকিয়ে হামেশা তার কাছে যাতায়াত করতিস।'

'বন্ধু না কচু! তখন তো ওর স্বরূপ চিনতে পারি নি! লোকটা কোত্থেকে গাদা-গাদা পুঁথিপত্তর জোগাড় করেছিল। তাই শুয়ে শুয়ে পড়ত আর তা থেকে মজার মজার গল্প শোনাত, সেই লোভেই যেতাম। তখন কি জানতাম ও এত বড় অপদার্থ!'

'শুধু অপদার্থ নয়'—সুশ্বেতা ঝঙ্কার দিয়া কহিল, 'শত্রু—শত্রু! আমাদের তো তিন পুরুষের শত্রু বটেই, দেশেরও শত্রু!'

'চুপ, চুপ!' সহসা মুখর জনতা নির্বাক হইয়া গেল।

সুবেদার আসিয়াছেন। ধীরে ধীরে তিনি নির্দিষ্ট আসনে গিয়া বসিলেন। তাঁর পিছনে ফৌজদার, এনায়েৎ খাঁ প্রভৃতি সপ্তগ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

দরবারের কাজ শুরু হইল। সুবেদার উঠিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক আলোচনা করিয়া ফকির সাহেবের উচ্চ প্রশংসা করিলেন। শেষে কহিলেন, 'এমন একজন লোক আজও এদেশে আছেন, প্রৌঢ় বয়সেও যিনি এতখানি বীরত্ব দেখাতে পারেন,—তা আমরা কল্পনাও করতে পারি নি। কিন্তু আজও তিনি নিজেকে লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চান। কিন্তু আমরা তা হতে দিতে পারি না। দেশের লোক তাঁর পরিচয় পেয়েছে, তারা তাঁকে দেখতে চায়—তাঁকে নিজেদের মধ্যে ভাল করে পেতে চায়। তাঁরই সম্মানের জন্য আজকের এই উৎসব।' সুবেদার একটু চুপ করিয়া কি ইঙ্গিত করিলেন, পাশে উপবিষ্ট একটি লোক রঙিন রেশমি কাপড়ের তৈরি একটি মোহরের তোড়া তুলিয়া তাঁর হাতে দিল। সুবেদার কহিলেন, 'শুনেছি তিনি সন্ন্যাসী, ধনরত্নের প্রতি তাঁর মোহ নেই। তবু তাঁরই দেশবাসীর দেওয়া এই স্নেহের উপহার তিনি নিশ্চয়ই গ্রহণ করতে আপত্তি করবেন না। দেশের প্রতিনিধি রূপে আমি তাঁকে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করছি।'

সমস্ত সভা স্তব্ধ। একটি সূচ পড়িলেও বোধহয় তার আওয়াজ শোনা যায়। সকলেই ব্যাকুল চোখে কিসের যেন প্রতীক্ষা করিতেছে।

সহসা ভিড়ের মাঝখান হইতে একটি দীর্ঘ, সৌম্যদর্শন মূর্তি সলজ্জভাবে সুবেদারের দিকে আগাইয়া আসিল। মাথায় পাগড়ি, পরনে ঢিলা আলখাল্লা—দীর্ঘ কাঁচা-পাকা দাড়ি বুকের উপর দুলিতেছে। সুবেদার উঠিয়া আসিয়া তার হাতে তোড়াটি জোর করিয়া গুঁজিয়া দিলেন, তারপর অকৃত্রিম আবেগে তাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। আকাশ-ফাটানো জয়ধ্বনি ও আনন্দকোলাহলে

সমস্ত সভামণ্ডপ কাঁপিয়া উঠিল

জয়ন্ত এতক্ষণ কোন রকমে নিজেকে সামলাইয়া রাখিয়াছিল; ফকির সাহেব নবাবের আলিঙ্গনমুক্ত হইতেই সে ছুটিয়া গিয়া তাঁর হাত ধরিল। ফকির হাসিমুখে তাহাকে বুকে টানিয়া লইলেন।

এর পর শুরু হইল পরিচয়ের পালা। ফকির সাহেবকে যারা আগে চিনিত তারা তো যোগ দিলই, অন্যান্য আরও অনেকে আসিল। রসরাজও তাদের মধ্যে একজন। ফকির স্মিতহাস্যে সকলের সহিত আলাপ জুড়িয়া দিলেন।

কিন্তু তার পরেই ঘটিল আর-এক আশ্চর্য ব্যাপার। সভা তখনও ভাঙে নাই, কথা বলিতে বলিতে রসরাজ হঠাৎ পাগলের মত এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। ফকিরের মুখের দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া তাঁর মনে কি সন্দেহ জাগিল তিনিই জানেন, হঠাৎ অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়া তিনি ফকিরের দীর্ঘ দাড়ি ধরিয়া এক হ্যাঁচকা টান দিলেন। ফকির হাঁ-হাঁ করিয়া বাধা দিবার আগেই রসরাজের হাতে তাঁর দীর্ঘ কাঁচা-পাকা নকল দাড়িটি সম্পূর্ণ উঠিয়া আসিল, এবং তার জায়গায় ফুটিয়া উঠিল এক সৌম্যদর্শন তরুণ যুবকের মুখ। আকস্মিক বিস্ময়ের ঝোঁকটা কাটিবার আগেই আশেপাশে মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল—'আরে, এ যে নন্দ চৌধুরী! চন্দনার জমিদার নন্দ চৌধুরী! তবে কি বৈরাগীও এ-ই?'

এর পরের ঘটনা আন্দাজ করা খুব কঠিন নয়। ছদ্মবেশ ধরা পড়িয়া যাওয়ায় নন্দ যতটা লজ্জা পাইল, মৃগাঙ্ক রায় এবং তাঁর আত্মীয় বন্ধুরা খুশি হইলেন তার চেয়ে অনেক বেশি। ইব্রাহিম খাঁও প্রচুর কৌতুক বোধ করিয়া নন্দর পিঠ আর-এক দফা চাপড়াইয়া দিলেন। সভার শেষে মৃগাঙ্ক রায় নন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, 'বাবা, তোমায় আমরা চিনতে পারি নি! পূর্বেকার বিরোধের কথা মনে করে শুধু সন্দেহই করে এসেছি। অবশ্যি, তুমি নিজেও চিনতে দাও নি, বরঞ্চ,

কেন জানি না, বরাবর ভুল ধারণা জন্মাতেই সাহায্য করেছ। যাই হোক, আজ আমার মনে যে কী আনন্দ হচ্ছে। সত্যি সত্যি, শেষটা চন্দনা বারোদীঘিকে এভাবে হারিয়ে দেবে আমরা ভাবতে পারি নি! কিন্তু যাক, পরাজিত হলেও, দেখো, আমারই জিত হবে। তুমি যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলে, না বুঝে আমরা তখন তাতে আমল দিই নি। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই ভুল বুঝবে না। এখন সুশ্বেতাকে তোমার হাতে সঁপে দিতে পারলে আমার পক্ষে তার চেয়ে সুখের আর কিছুই হতে পারবে না। সুশ্বেতাও তেমনি সুখী হবে। সুশি! কোথায় গেল সুশ্বেতা! এই তো এখানে ছিল!'

জবাব দিলেন রসরাজ। কহিলেন, 'লজ্জায় পালিয়েছে। এতদিন চন্দনার সম্বন্ধে যা বলত,—এখন কি আর সামনে আসতে পারে!'

নন্দ কোন জবাব দিল না। হেঁট হইয়া মৃগাঙ্ক রায়ের পায়ের ধূলা লইয়া সম্ভবত ভাবী সম্পর্কটা মানিয়া লইল।

রসরাজ হাসিতে হাসিতে কহিলেন, 'সুশির বিয়েতে কিন্তু, রায় মশাই, তোমার ও বোষ্টুমি কাণ্ড আর চলবে না! নেমন্তন্নর মাছের ভার আমি নেব। টাটকা ইলিশ—গঙ্গায় না পাই, খোদ পদ্মা থেকে আনিয়ে নেব, হুঁ! স্বয়ং সুবেদার সাহেব এখন আমাদের বন্ধু!'

অদূরে একটু সামান্য সোরগোল শোনা গেল—একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বগলে ছাতা লইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে এদিকেই ছুটিয়া আসিতেছেন। চিনিতে বিলম্ব হইল না—আর কেউ নয়, স্বয়ং ব্যাকরণবাগীশ মহাশয়।

কিন্তু এ কী কাণ্ড! ব্যাকরণবাগীশ আজ তাঁর চিরাভ্যস্ত প্রাথমিক কুশল প্রশ্ন বা কুশল জ্ঞাপন ব্যাপারটি বেমালুম ভুলিয়া গেলেন,—হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিলেন, 'ঘটক-বিদায়টা কিন্তু আমার পাওনা রায় মশাই! সেটি ভুললে চলবে না!'